উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

অনির্বাণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত-প্রসার গ্রন্থমালা—২

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

ঈশোপনিষৎ

অনির্বাণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান
১৯৯৬

Upanisad Prasanga
(Volume I)
By Srimat Anirban

প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৭২
দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৯
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
তৃতীয় সংস্করণ : ১লা পৌষ ১৪০৩
২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬

© বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পঁচিশ টাকা

প্রকাশক :
মৃদুল কান্তি সেন
ইনচার্জ-পাব্লিকেশন ইউনিট
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
রাজবাটি, বর্ধমান

মৃদুল কান্তি সেন কর্তৃক
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
প্রেস, রাজবাটি, বর্ধমান
থেকে মুদ্রিত

এ. এস. বি. ইউ. পি. ২৫/১২-৯৬/১১০০ (সি)

নিবেদন

'উপনিষৎ-প্রসঙ্গ' কলকাতায় নিয়মিতভাবে প্রথম শুরু হয় স্বর্গত বন্ধু ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভা'য়। ঈশোপনিষদের উপর ভাষণগুলি অনুলিখিত ও সম্পাদিত হয় শ্রীমতী সন্ধ্যাদেবীর দ্বারা। বর্তমান গ্রন্থ তাকে অবলম্বন করে পুনর্লিখিত হয়েছে। ভূমিকায় উপনিষৎ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ভাষকের 'বেদ-মীমাংসায়' প্রকাশিত আলোচনার সারসংক্ষেপ।

ঈশোপনিষদের বিবৃতিতে বেদের যে সমস্ত প্রমাণমন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে, কালাতিক্রম দোষ (anachronism) এড়াবার জন্য প্রায় সর্বত্র তাদের সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক—এবং উপনিষদের বেলায়—ছান্দোগ্য কৌষীতকি ও বৃহদারণ্যকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ সবই ঈশোপনিষদের হয় প্রাক্তন কিংবা সমসাময়িক। বৈদিকভাবনার ধারাবাহিকতাকে এইভাবে যথাসম্ভব ইতিহাসসম্মত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেখা যাবে, আসল বেদার্থ একটি অখণ্ড মৌলভাবনার বাহন। শ্রুতির নিত্যত্ব এবং প্রামাণ্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি এইখানে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রাধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে ও উদ্যোগে এবং তদানীন্তন উপাচার্য মাননীয় ব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের আমন্ত্রণে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বর্তমান প্রসঙ্গটি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অতিরিক্ত ভাষণমালা' (Extension Lectures) রূপে পঠিত হওয়ার পর ওখান থেকেই তার প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য আমি এই সুধীদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। মুদ্রণব্যাপারের সমস্ত ভার নিজের উপরে নিয়ে ডঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরও ঋণী করেছেন।

উদ্যোক্তা শ্রোতা এবং প্রকাশয়িতা সবার হৃদয়ে বেদমাতা বিদ্যোতিত হন, এই প্রার্থনা।

"হৈমবতী" — অনির্বাণ

শ্রীপঞ্চমী, ১৮৮৭ শকাব্দ

ভূমিকা

উপনিষদের আরেক নাম 'বেদান্ত'। বেদান্ত কিনা বেদের অন্ত। 'অন্ত' বলতে বোঝায় শেষ পর্ব অথবা শেষ মীমাংসা। উপনিষদ্ এই দুই অর্থেই বেদান্ত।

মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ দুয়ের সমাহারের নাম হল বেদ। মন্ত্র বেদের প্রাচীনতম অংশ এবং মূল কাঠামো। তাতে যে অনুভবের ব্যঞ্জনা এবং সাধনার সঙ্কেত আছে, তাকেই পরিস্ফূট করা হয়েছে ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণের তিন ভাগ—ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষদ্। তিনটির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। একটি আরেকটির সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে অনেকসময় তাদের পরস্পরের সীমা-নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাতে এই প্রমাণিত হয়, সমগ্র বেদ একটি অখণ্ড ভাবনার বাহন, তার এক অংশ আরেক অংশের প্রতিবাদ নয়। মন্ত্রাংশে যে-অনুভব বোধিদীপ্ত, উপনিষদংশে তারই বুদ্ধিসম্মত বিবৃতি। এইভাবে উপনিষদ্ বেদের শেষ পর্ব বা শেষ মীমাংসা এই উভয় অর্থেই বেদান্ত।

বেদান্ত যেমন বেদবাদের অন্ত বা চরম মীমাংসা, তেমনি সিদ্ধদের চরম অনুভবের বিবৃতি হল 'সিদ্ধান্ত'। বেদান্তের ধারক হলেন 'ঋষি', আর সিদ্ধান্তের ধারক 'মুনি'। গীতায় পাই, 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।'[১] কপিলপ্রবর্তিত সাংখ্য ভারতীয় দর্শনের একটি ধারা—এটি মুনিধারা বা তর্কপ্রস্থান; আর বেদান্ত হল ঋষিধারা বা মীমাংসাপ্রস্থান। সাধনার বেলা একের দৃষ্টি প্রত্যক্ বা অন্তরাবৃত্ত, অপরের দৃষ্টি পরাক্ বা বহিরাবৃত্ত। মুনি অন্তরে তলিয়ে গিয়ে দেখছেন নিজেকে বা আত্মাকে; আর ঋষি দুচোখ মেলে সর্বত্র দেখছেন দেবতাকে বা ব্রহ্মকে। আবার এই ঋষিই উদ্দীপ্ত

কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, 'ওই ওই যে-পুরুষ, সেই হচ্ছি আমি; আমার মধ্যে যে-পুরুষ আর ওই আদিত্যে যে-পুরুষ দুই-ই এক; এই আত্মাই ব্রহ্ম।'[২]

এমনি করে দুটি দৃষ্টিকোণ হতে যাত্রা শুরু করে বেদান্ত আর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মিলে গেছে পরমার্থের এক অখণ্ডদর্শনে—প্রাচীন উপনিষদগুলির সর্বত্র দেখতে পাই নভোনীলিমায় আদিত্যের মত যার উদার প্রদ্যোত। এই প্রদ্যোতই বেদার্থ, উপনিষদ্ যার অন্ত।

বেদান্ত আর সিদ্ধান্ত যেমন পরস্পরের অনুপূরক, বেদান্ত বা বেদবাদের অন্তর্গত জ্ঞানকাণ্ড আর কর্মকাণ্ডও তা-ই। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ডের ধারক, আর উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের; আরণ্যক দুয়ের মাঝামাঝি। স্বভাবতই কর্ম আর জ্ঞান সমুচ্চিত বা সহচরিত। কর্মের মূলে রয়েছে ইচ্ছা, যার মূলে আছে লক্ষ্যের জ্ঞান এবং তার প্রবর্তনা। বৈদিক কর্মের লক্ষ্য অলৌকিক অর্থাৎ 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় কোনও পদার্থ'—যেমন অমৃত বা বৃহৎ জ্যোতি বা দেবতার সাযুজ্য। কর্মের পরিণামে এই বস্তুটি চেতনায় সুস্পষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ হতে উপনিষৎ পর্যন্ত সর্বত্র আমরা 'সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে' —গীতার এই অনুশাসনের[৩] প্রপঞ্চন দেখতে পাই। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেরই অঙ্গ, তার বিরোধী নয়। ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার অর্থই হল ব্রহ্মবাদীদের 'ব্রহ্মোদ্য' বা 'বাকোবাক্য' অর্থাৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত পরিপ্রশ্ন বিচার এবং মীমাংসা। আর 'ব্রহ্মে'র অর্থ হল মন্ত্র বা চেতনার বিস্ফারণে ঋষির হৃদয়ে স্ফুরিতা দিব্যা বাক্। তার তাৎপর্য জ্ঞানেও হতে পারে, কর্মেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ঋক্‌সংহিতার হিরণ্যগর্ভসূক্তের[৪] উল্লেখ করা চলে। তার ধুরায় আছে, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—আহুতি নিয়ে কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করে চলবে আমাদের একাগ্র অভিযান? মন্ত্রের প্রথম তিন পাদে আছে উদ্দিষ্ট দেবতার পরিচিতি। এখানে আহুতি আর

অভিযান কর্ম, দেবতার পরিচয়লাভ জ্ঞান। কর্ম করা হচ্ছে জ্ঞানের জন্যই। পরিপ্রশ্নের ভাবনাও মন্ত্রের অঙ্গীভূত। এই কর্ম নিয়ে যেমন বিচারের প্রয়োজন আছে, তেমনি জ্ঞান নিয়েও। দুটি বিচার পরস্পরের অনুপূরক। ব্রাহ্মণে উল্লিখিত ব্রহ্মবাদী আর উপনিষদের ব্রহ্মবাদী—দুয়ের জাত আলাদা নয়। পরিপ্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা তথাকথিত উপনিষদের যুগে হঠাৎ দেখা দিয়েছে ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিরাগের ফলে—ইওরোপীয় পণ্ডিতদের এ-প্রকল্প একেবারেই ভিত্তিহীন। এদেশে জ্ঞানসহচরিত কর্মের অনুষ্ঠান কোনও যুগেই লোপ পায়নি—এমন-কি 'অদেব অযজ্ঞ' আর্যসম্প্রদায়দের দুর্ধর্ষ প্রতিপত্তির ফলেও নয়। ভাবনাহীন কর্মের নিন্দা বেদেই পাই, দ্রব্যযজ্ঞকে জ্ঞানযজ্ঞে পরিণামিত করবার সঙ্কেতও দেওয়া আছে। প্রাচীন উপনিষদগুলির প্রথম দিকে আমরা তার বিস্তৃত বিবৃতি দেখতে পাই।

মোটকথা, যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, মীমাংসা ও তর্কের অথবা শ্রুতি ও ন্যায়ের সমাহারে, কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে উপনিষদ্ এক অখণ্ড বেদার্থের অঙ্গ বা বেদান্ত। প্রসঙ্গত এও স্মরণীয়, সমগ্র বেদমীমাংসাকে ষোড়শাধ্যায়ীরূপে পরিচিত করা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। তার মূলে রয়েছে এক অখণ্ড ষোড়শকল বেদপুরুষেরই ন্যায়সিদ্ধ রূপায়ণের প্রযত্ন।

'উপনিষদ্' সংজ্ঞাটির অর্থ নিয়ে এযুগে অনেক বিতর্ক হয়েছে। উপ-নি√সদ্ (বসা) হতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি। তাই তার মৌলিক অর্থ দাঁড়ায় 'কাছে নিবিড় হয়ে বসা'। এইথেকে ইওরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত, অরণ্যে আচার্যের কাছে একান্তে বসে যে-বিদ্যা গ্রহণ করা হত, তার নাম 'উপনিষদ্'। কিন্তু লক্ষণীয়, আচার্যের কাছে গিয়ে বিদ্যাগ্রহণের কথা উপনিষদের বহুজায়গায় থাকলেও 'বসা' অর্থে উপ-নি√সদ্ বা নি√সদ্-এর ব্যবহার প্রাচীন উপনিষদ্-

গুলির কোথাও নাই। সব বিদ্যাই আচার্যের কাছে গিয়ে পরিচর্যার দ্বারা গ্রহণ করতে হত, সুতরাং সামান্যার্থে সব বিদ্যাকেই তো উপনিষদ্ বলা চলে। তাইতে বোঝা যায়, 'উপনিষদ্'এর ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ এখানে খাটছে না, শব্দটি একান্তভাবেই পারিভাষিক।

'উপনিষদ্' শব্দের সবচাইতে প্রাচীন উল্লেখ আছে শাকল-সংহিতার একটি খিলসূক্তে—সেখানে একসঙ্গে আছে 'নিষচ্ চো. পনিষচ্ চ'।[৫] আবার মহাভারতেও আছে, 'রাকেষু অনুরাকেষু নিষৎসু.পনিষৎসু'—যা সঙ্গতভাবেই যথাক্রমে বোঝাচ্ছে মন্ত্র, তদনুসারী ব্রাহ্মণ, তার রহস্যজ্ঞাপক আরণ্যক এবং তত্ত্বজ্ঞাপক উপনিষৎকে।[৬] পারিভাষিক অর্থে 'নিষৎ' শব্দ সংহিতা ও ব্রাহ্মণেও আছে, বোঝায় 'আধারে দেবতার আবেশের অনুভব'।[৭] ব্রাহ্মণে এবং আরণ্যকেও 'উপনিষদ্' সংজ্ঞা পারিভাষিক অর্থে বুঝিয়েছে 'নিগূঢ়' বা অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব। সবদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তই হয়, উপনিষদের যা নিরুক্তিলভ্য অর্থ, তার উদ্দিষ্ট মানুষ নয়—দেবতা। দেবতা এসে আচার্যের হৃদয়ে 'নিষণ্ণ' হলে সেই আবেশে তাঁর মধ্যে যে-তত্ত্ববোধের স্ফুরণ হয়, তা-ই 'উপনিষদ্'—যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখি, ঊর্ধ্বস্রোতা বুদ্ধচেতনায় উদ্দীপ্ত বাণীর নাম 'উদান'। এই অর্থই স্বাভাবিক এবং পরম্পরাগত। আচার্যের 'কাছে বসে' বিদ্যাগ্রহণ অর্থ গৌণ এবং আনুষঙ্গিক মাত্র।

শঙ্করাচার্য 'উপনিষদ্'এর অর্থ করেছেন 'যা অবিদ্যা নাশ করে'। তার জন্য আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁর প্রতি কটাক্ষ করেছেন। শঙ্করের নিরুক্তি শব্দশাস্ত্রসম্মত না হলেও মনে হয়, তারও একটা বৈদিক ভিত্তি আছে। সোমযাগে 'উপসদ্' নামে একটি ইষ্টির বিধান আছে। ব্রাহ্মণে আছে, অসুরেরা তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল—পৃথিবীতে লোহার, অন্তরিক্ষে রূপার, আর দ্যুলোকে সোনার। দেবতারা যে-ইষ্টির সহায়ে এই তিনটি দুর্গ ভেঙে দিয়েছিলেন, তা-ই হল 'উপসদ্'[৮]। আবার ঋক্‌সংহিতায় দেখি

'উপাসনা'র মতই দেবতার নিত্যসামীপ্যের ভাবনার নাম 'উপসদ্'।[৯] দুটি অর্থ মিলিয়ে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাপারটি হল অবিদ্যার দুর্গ ভাঙা, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'অবিদ্যাগ্রন্থির বিকিরণ'। দেবতা 'উপসন্ন' বা 'নিষণ্ণ' অর্থাৎ আধারে আবিষ্ট হলেই তা সম্ভব। 'উপসদ্' আর 'উপনিষদ্' এই একই ভাবনার দুটি সংজ্ঞা। সুতরাং শঙ্করের ব্যাখ্যা একেবারে অমূলক নয়।

আজপর্যন্ত প্রায় দু'শ'র বেশী উপনিষদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে কিনা তাদের অধিকাংশই অর্বাচীন। বেদের আরণ্যকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত উপনিষদ্ হল এই কয়খানি—ঐতরেয় কৌষীতকি ছান্দোগ্য কেন তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যক। মহানারায়ণ বা যাজ্ঞিকী উপনিষদ্ তৈত্তিরীয়ারণ্যকের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রাচীন কাল হতেই এটিকে খিল বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে ঐতরেয় প্রভৃতি ছয়টি উপনিষদ্ই ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গির বিচারে সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য হতে পারে। এ-কয়খানিই ব্রাহ্মণের মত গদ্যে রচিত, কেবল কেনোপনিষদের প্রথম দুটি খণ্ড পদ্যে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এসবই বুদ্ধপূর্ব যুগের রচনা। কোনও ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত না হলেও কঠ শ্বেতাশ্বতর মুণ্ডক এবং প্রশ্নও সম্ভবত তা-ই। প্রথম তিনটি পদ্যে রচিত, শেষেরটি প্রায়শ গদ্যে। পূর্বোক্ত মহানারায়ণোপনিষদ্ও প্রশ্নেরই মতন। মৈত্রায়ণীয় এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ গদ্যে রচিত, কিন্তু সে-গদ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণের গদ্য নয়। উপনিষদের বৈদিক ধারা সাক্ষাৎভাবে এইখানে এসে শেষ হয়ে গেছে বলা যেতে পারে।

এই তেরটি ছাড়া আরেকটি বিশিষ্ট উপনিষদ্ হল 'ঈশা'। এটি কোনও ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নয়, সোজাসুজি সংহিতারই পরিশেষ। মোটের উপর প্রচলিত এই চৌদ্দটি উপনিষদ্‌কে সম্প্রদায়াগত বৈদিক তত্ত্বভাবনার বাহন বলা চলে।

উপনিষদের বৈদিক ধারা লোকাতত হয়েছে ইতিহাস-পুরাণের ভিতর দিয়ে। উপনিষদ্ তখন আর 'শ্রুতি' নয়, 'স্মৃতি'। যেমন মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতা—যা স্মৃতি এবং উপনিষদ্ দুইই। লোকোত্তরের আবেশে চেতনায় পরমার্থের যে-স্ফুরণ, তার বাণীরূপ যদি উপনিষদ্ হয়, তাহলে গীতার এ-সংজ্ঞা অসঙ্গত নয়। তাই দেখি, পরবর্তী যুগেও বৈদিক এবং অবৈদিক সব সম্প্রদায়-প্রবর্তক তাঁদের পরম উপলব্ধিকে উপনিষৎসংজ্ঞায় চিহ্নিত করেছেন। এমনি করে এই সংজ্ঞাটি ভারতবর্ষের বিচিত্র অধ্যাত্মসিদ্ধির মধ্যে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত করে তুলতে সাহায্য করেছে, এটি কম লাভের কথা নয়। সাম্প্রদায়িক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোনও শ্রুতিকে কেউ অমান্য করতে পারে না। সুতরাং নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে অপরের ভাবনার সমন্বয়ের প্রয়াস আপনা থেকেই এসে পড়ে। ঔপনিষদ্ ভাবনা তাই ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনার একটি অপরিহার্য সাধন হয়ে এসেছে যুগে-যুগে।

এইবার একে-একে পূর্বোক্ত বৈদিক উপনিষদগুলির পরিচিতিতে আসা যাক। আরম্ভ হ'ক, শুক্লযজুর্বেদের ঈশোপনিষদ্ দিয়ে। আগেই বলেছি, এটি ব্রাহ্মণের মাধ্যমে নয়, সাক্ষাৎভাবেই সংহিতার সঙ্গে যুক্ত—এই এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ যেন অখিল কর্মের জ্ঞানে পরিসমাপ্তির উদাত্ত ব্রহ্মঘোষ, দেহলীদীপের উদ্দ্যোতে কর্ম আর জ্ঞানের মধ্যে সার্থক সেতুবন্ধন।

মুখবন্ধ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত 'সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালা'র এইটি দ্বিতীয় অর্ঘ্য। বৈদিক সাহিত্য-সংকলনের মাধ্যমে আমরা এই গ্রন্থমালার সূচনা করেছিলাম। সঙ্গতভাবেই এবং পরম্পরাক্রমে তারপরে উপনিষদের প্রকাশ অপেক্ষিত ছিল। তবে উপনিষদের কোনো অভিনব ভাষ্য বা আলোচনাসহ বিশিষ্ট কোনো গ্রন্থ প্রকাশের সৌভাগ্য আমাদের ঘটবে—এ আশা তখন করিনি। কিন্তু সে-দুর্লভ সুযোগ আমাদের কাছে সুখলভ্য হ'ল অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ অনির্বাণের অকৃপণ স্নেহদাক্ষিণ্যে। গত বৎসরে আমাদের সংস্কৃত বিভাগের পক্ষ থেকে আয়োজিত প্রসার-বক্তৃতামালা প্রদানে যখন তাঁকে আহ্বান জানাই তখন তিনি সাগ্রহে সাড়া দেন এবং বক্তৃতার বিষয়রূপে ঈশোপনিষৎকেই নির্বাচন করেন। পরে এই বক্তৃতামালা প্রকাশ করবার সানন্দ অনুমতি দান করে তিনি আমাদের অনুগৃহীত করেন। এর ফলে আমাদের গ্রন্থমালা যেমন গৌরবান্বিত, ঔপনিষদ ভাবনার মর্মবাণীও তেমনি নব আলোকে উদ্ভাসিত হ'ল বলে মনে করি। ঋষিকল্প গ্রন্থকার আমাদের ভরসা দিয়েছেন যে তাঁর উপনিষৎ-প্রসঙ্গ অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হ'বে এবং পরবর্তী খণ্ডগুলিতে অন্যান্য প্রধান উপনিষদ্‌গুলিও তিনি ক্রমশঃ আলোচনা করবেন। আমরা সেগুলি প্রকাশ করবারও সুযোগ লাভ করে ধন্য হ'ব—এই আশা রাখি।

উপনিষৎ-প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ডে ঈশোপনিষদের প্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূজনীয় গ্রন্থকার তাঁর যুগান্তকারী মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'র দুটি খণ্ডে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন যে বৈদিক ভাবনার মৌল রূপটি একটি অখণ্ড সুষমায় বিধৃত ও প্রকাশিত। আমরা এতদিন য়ুরোপীয় সংস্কৃতবিদ্‌গণের ভ্রান্ত দুর্ব্যাখ্যায় তাকে স্ববিরোধী নানা খণ্ড ভাবনার সমষ্টিরূপেই দেখে এসেছি। দীর্ঘ পরাধীনতার দরুন স্বকীয় বা স্বাধীন চিন্তার শক্তিও আমরা হারিয়ে বসেছিলাম। আমাদের মধ্যে যাঁরা ভারতের সনাতন ভাবধারায় বিশ্বাসী, প্রাচীন ঐতিহ্যে একান্ত শ্রদ্ধাশীল বা পরম আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে

আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকার ফলেই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পক্ষে বেদার্থের যথাযথ উপস্থাপন সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁদের সে-উপলব্ধি শুধু মৌন শ্রদ্ধা বা অন্ধবিশ্বাসমাত্ররূপে তাঁরা হৃদয়ে লালন করেছেন। অথচ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিধিবদ্ধ বিচারশৈলী বা বিজ্ঞানসম্মত সুগ্রথিত চিন্তাধারার যৌক্তিকতা খণ্ডন করার মত পাল্‌টা যুক্তিজাল বা প্রমাণপঞ্জী হাজির করার কোনো মুখর প্রয়াস বা দুঃসাহস আমাদের হয়নি এতদিন। শ্রীমৎ অনির্বাণের মধ্য দিয়ে ভারত-আত্মা যেন তার দীর্ঘ মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে এবং বুদ্ধির দরবারে গ্রাহ্য তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানাদি সমস্ত আধুনিক পদ্ধতির নিপুণ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আপন বোধির পরম উপলব্ধিকে আবার প্রকাশ করেছে।

শ্রীমৎ অনির্বাণ একাধারে কবি ও মনীষী। বুদ্ধি ও বোধির এক অতি দুর্লভ আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে। বোধির স্বচ্ছ আলোকে তিনি বেদবাণীর যে অখণ্ড রূপটি দেখেছেন তাকেই আবার তাঁর বৈশারদী বুদ্ধি যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে আমাদের কাছে গ্রাহ্য করাবার অতন্দ্র প্রয়াসে ব্যাপৃত। সে-যুক্তি ও প্রমাণ সকলের কাছে গ্রাহ্য না-ও হ'তে পারে। অনেকে বেদের উপর একে নিছক আধ্যাত্মিকতার আরোপ বলে উপহাসও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর অনুভব ও বিচার দুই-ই এক সুরে বলে যে বেদ ও উপনিষদ্ একই অবিচ্ছিন্ন ভাবধারা। এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশী প্রত্যয় বা বিশ্বাস এনে দেয় ঈশোপনিষদের মন্ত্রগুচ্ছ। বেদ প্রধানত কর্মমূলক ও উপনিষদ্ জ্ঞানমূলক—এই আমাদের প্রচলিত ধারণা এবং আমরা আরও মনে করি কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে পর্বতের মত অকম্প্য, অটল বিরোধ। কিন্তু এই উপনিষদে আমরা শুনি ভিন্ন সুর—কর্ম ও জ্ঞানের 'সাহিত্য' বা সমন্বয়ের বাণী।

এই সমন্বয়কে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীমৎ অনির্বাণ তাঁর ব্যাখ্যায়। এই ব্যাখ্যার অভিনবত্ব এইখানে যে তিনি ঈশোপনিষদের পূর্ববর্তী বেদ এবং সমসাময়িক প্রাচীন উপনিষদ্গুলির মধ্যেই তাঁর প্রমাণগুচ্ছকে নিবদ্ধ রেখেছেন। পরবর্তী কালের কোনো দার্শনিক চিন্তাধারার পরিভাষা দিয়ে বা ঈশোপনিষদের পরবর্তী কোনো গ্রন্থের প্রমাণ দিয়ে আপন বক্তব্যকে স্থাপন করবার প্রয়াস করেননি। অগ্রজাত বৈদিক ভাবনার সঙ্গে সুনিবদ্ধ হ'লেই যে এই উপনিষদের মর্মগ্রহণ সুখসাধ্য হয় তা তিনি প্রমাণিত করেছেন 'বিদ্যা-অবিদ্যা', 'সম্ভূতি-অসম্ভূতি' প্রভৃতি দুর্বোধ্য তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যায়। পূর্ববর্তী

সব আচার্য এবং ব্যাখ্যাতৃগণের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখেও দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায় যে ঈশোপনিষদের ঐ সব শব্দগুলির কোনো ব্যাখ্যাই আজ পর্যন্ত 'হৃদয়-সংশয়োচ্ছেদী' হয়নি। সংশয় আরও গভীরতর হয় যখন উপনিষদ্‌গুলির মধ্যেই দেখি পরস্পরবিরোধী সুর—যেমন, এই বিদ্যা-অবিদ্যা সম্বন্ধে কঠোপনিষদে সুস্পষ্ট বিরোধের ও বৈপরীত্যের ঘোষণা :

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞেয়া।

এবং অবিদ্যার প্রলোভন ত্যাগ করে' শুধু বিদ্যাকেই বরণ করায় যম অভিনন্দিত করলেন নচিকেতাকে। অথচ এখানে ঈশোপনিষদে বিদ্যা-অবিদ্যার সমন্বয়-সাধনের ওপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হ'য়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কঠোপনিষদ্ যে-অর্থে বিদ্যা-অবিদ্যাকে গ্রহণ করেছেন ঈশোপনিষদে তা' করা হয়নি। এখানে শব্দ দু'টির তাৎপর্য ভিন্নতর। নতুবা আমাদের এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে উপনিষদ্‌গুলি আন্তর্বিরোধে পরিপূর্ণ। তাই এই বিরোধের নিরসনকল্পে 'বিদ্যা-অবিদ্যা' প্রভৃতি শব্দগুলির নিগূঢ় মর্ম উদ্ধারে যত্নশীল হ'তে হ'বে শ্রুতিকে অবলম্বন করেই গভীর ধ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন মননের সাহায্যে, যেমন শ্রীমৎ অনির্বাণ প্রয়াসী হ'য়েছেন। শ্রীমৎ অনির্বাণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা'তে সকলের মন সায় না দিতে পারে কিন্তু তা'তে 'অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুতরণ' যে একটা অর্থহীন প্রলাপ বা হেঁয়ালী নয়—এটুকু অন্তত সকলের হৃদয়ঙ্গম হ'বে এবং আমরা আশা করি যে অনেকের মনে আবার নতুন করে উপনিষদের মহার্ণবে অবগাহনের প্রেরণা জাগবে।

এই সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালার প্রবর্তক, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে গভীর শ্রদ্ধাশীল আমাদের প্রাক্তন উপাচার্য মাননীয় শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয়কে কৃতজ্ঞচিত্তে আজ স্মরণ করি। গ্রন্থপ্রকাশন সম্ভব হ'ত না যদি গত বৎসরে তিনি শ্রীমৎ অনির্বাণকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঈশোপনিষদ্ সম্বন্ধে ভাষণ দিতে সাদর আহ্বান না জানাতেন এবং আমাদের বর্তমান উপাচার্য পরম সংস্কৃতানুরাগী মাননীয় ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা-সচিবরূপে সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালার জন্য অকুণ্ঠে অর্থানুকূল্য না করতেন এবং আশু এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য নিরন্তর উৎসাহ না দিতেন। তাই এঁদের উভয়ের কাছে সংস্কৃতানুরাগীমাত্রেই অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবেন চিরদিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি সংস্কৃতের প্রচারে ও প্রসারে তাঁদের এ আনুকূল্যলাভে আমরা ভবিষ্যতেও বঞ্চিত হ'ব না।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

'উপনিষদ্-প্রসঙ্গ'-এর দুইটি খণ্ডই পুনর্মুদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু দুঃখের কথা যিনি ইহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করিতে পারিতেন, সেই স্বনামধন্য অলোকসামান্য প্রতিভাধর মহামনীষী গ্রন্থকার ইতিমধ্যে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অসামান্য অবদান যে উপনিষদ্ সম্বন্ধে সকলকে যথাযথ অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত। সকলের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি না হইলে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাইত না এবং পুনর্মুদ্রণেরও প্রয়োজন দেখা দিত না।

দুইটি খণ্ডের বিষয়বস্তুই পৃথক্ ও স্বতন্ত্র এবং একত্রে দুইটি খণ্ড পাঠ করিলে মোটামুটি উপনিষদ্ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হইবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের কাছে দুইটি খণ্ডই সুপ্রাপ্য করিয়া দিলেন, এজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

২৩ জানুআরি ১৯৮৩
তারাবাগ, বর্ধমান

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকার পরিচিতি

অনির্বাণ—মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের (ইং ১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ, ও এম্‌-এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২১ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত আসাম-বঙ্গীয় সারস্বতমঠে সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং প্রখ্যাত আর্যদর্পণ পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্নস্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্থ বেদমীমাংসা, যা পরে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে উপলব্ধ সত্যের প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর 'Life Divine এর অনুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ A living translation বলে অভিনন্দিত করেন।

১৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদ্‌-ভাষ্য রচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন।

বাইরে শীর্ণ তপস্বীমূর্তি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাউল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প।

ভারত-বন্দনা-রূপে সঙ্কল্পিত তাঁর ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭তে কেদার-বদ্রিনাথে সমাপ্ত হয়। ১৯৭১-এ আকস্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হন। ঐ-অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থীর আশ্রয়স্থল ছিলেন। ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ করেন।

গৌরী ধর্মপাল

মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ

জন্ম : ২৪ আষাঢ় ১৩০৩ তিরোভাব : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

ঈশোপনিষদ্

সাধারণ পরিচয়

এই উপনিষদটি শুক্লযজুঃসংহিতার শেষ অধ্যায়। অধ্যায়ের প্রারম্ভমন্ত্রের প্রতীক দিয়ে তার নামকরণ হয়েছে 'ঈশা'।

যজুর্বেদের নামান্তর হল কর্মবেদ বা অধ্বর্যুবেদ। যজ্ঞই সত্যকার কর্ম। দেবতার উদ্দেশে যে-দ্রব্যত্যাগ, তা-ই যজ্ঞ। যিনি ত্যাগ করেন, তিনি যজমান। ত্যাগের দ্রব্যটি যজমানের প্রতিনিধিস্থানীয়। সুতরাং দ্রব্যত্যাগ স্বরূপত আত্মত্যাগ। ত্যাগের স্থূল অনুষ্ঠানটি নানা কারণে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতে তার জন্য অপরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। যাঁরা যজমানের হয়ে এই জটিল অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করেন, তাঁরা 'ঋত্বিক্'। সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ সোমযাগে চার শ্রেণীর ঋত্বিক্ থাকেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আহুতিদান এবং তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁদের প্রধান হলেন 'অধ্বর্যু'। ঋক্সংহিতার ভাষায়, তিনি যজ্ঞের শরীর নির্মাণ করেন।[১] যে-মন্ত্রের সাহায্যে এই কাজটি তিনি করেন, তার নাম হল 'যজুঃ'। ঋক্সংহিতার মতে এগুলি কারণসলিলে নিহিত সেই শক্তিকূট, যা ধ্যানচেতনার আরোহ-অবরোহের সাধন, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পরম অব্যক্তের রহস্যনিথরতা বিশ্বপ্রাণের নির্ঝরণ এবং আত্মচৈতন্যের উদ্দীপন।[২] যজুর্বেদ হল এইসব যজুর্মন্ত্রের সংকলন প্রয়োগ এবং বিবৃতির আধার।

যজুর্বেদের দুটি ধারা—কৃষ্ণ আর শুক্ল। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ যার মধ্যে একসঙ্গে মেশানো তা কৃষ্ণ, আর যাতে তারা আলাদা-আলাদা তা শুক্ল—সংজ্ঞা দুটির এই ব্যাখ্যাই প্রচলিত। কিন্তু

এ-বিচার মনে হয় উপরভাসা। শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণের শেষে আছে, 'বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য হতে এইসব শুক্ল যজুঃ পেয়ে তাদের প্রকাশ করছেন।'[৩] সুতরাং এগুলি আদিত্যভাবনার দ্বারা ভাস্বর বলেই শুক্ল। শুক্লযজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেখি, এই বেদের ব্রহ্ম এবং আদিত্য নামে দুটি সম্প্রদায় ছিল। আদিত্যসম্প্রদায়ের আদিত্যোত্তর প্রথম দুজন আচার্য অম্ভিনী এবং বাক্। অম্ভিনী-কন্যা বাক্ ঋক্‌সংহিতার প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের ঋষিকা। দেবীসূক্তে তাঁর সর্বাত্মভাবনার যে-উল্লাস দেখি, তা যদি যজুর্বেদসাধ্য কর্মপ্রেরণার উৎস হয়, তাহলে আদিত্যদ্যুতিতে কর্মসাধনা বস্তুতই 'শুক্ল' হয়ে ওঠে। এই অভিপ্রায় ছিল বলে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের তুলনায় আদিত্যসম্প্রদায় নিঃসন্দেহে একটা বিপ্লবী মনোভাবের ধারক ও পোষক। এই সম্প্রদায়ের আচার্যেরা বেদমন্ত্রকে 'অযাতযাম' (অর্থাৎ যা বাসী-পচা নয়) রাখতে চেয়েছিলেন জ্ঞানের আদিত্যবৎ প্রকাশকে অন্তরে উদ্দীপ্ত রেখে। জাবালসংহিতায় এ-সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে, 'অয়াতয়ামসংজ্ঞোঽয়ং কৃৎস্নকর্মপ্রকাশকঃ।' 'কৃৎস্নকর্ম' গীতার একটি পারিভাষিক শব্দ। যে-যোগী কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনি কৃৎস্নকর্মকৃৎ।[৪] এই দর্শনের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রবর্তিত বাজসনেয়-সংহিতা বা শুক্লযজুঃসংহিতায় উল্লিখিত দর্শনের মিল আছে। আমরা পরে দেখব, তা ত্যাগ ও ভোগের বিদ্যা ও অবিদ্যার সম্ভূতি ও বিনাশের সমন্বয়ের দর্শন, কর্ম করেও তার দ্বারা লিপ্ত না হওয়ার দর্শন। এই হল কর্ম ও জিজীবিষার আদিত্যভাস্বর শুক্লত্ব।

ঈশোপনিষদ পদ্যে রচিত, আকারে নিতান্ত ছোট, মন্ত্রসংখ্যা কাণ্বশাখায় মোটে আঠারো। কিন্তু এই কয়টি মন্ত্রের মধ্যেই বৈদিক ভাবনার একটি সর্বতোভদ্র রূপ এবং একটি অখণ্ড জীবন-দর্শন প্রসন্ন-গম্ভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। গৃধ্নুতাদুষ্ট কৃষ্ণকর্মের নির্লিপ্ত

অথচ সমর্থ শুক্লকর্মে রূপান্তর এবং তার পরিসমাপ্তি ঔপনিষদ-পুরুষের বিশ্বতোমুখ বিজ্ঞানে ও সর্বাত্মভাবনার স্বচ্ছন্দ বিচ্ছুরণে—এইটি এই উপনিষদের মূল কথা। লক্ষণীয়, এতে অন্যান্য উপনিষদের মত 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ নাই; তার জায়গায় আছে নির্বিশেষ 'তৎ' ও সবিশেষ 'ঈশ্' এবং 'পুরুষ' শব্দ। আর আছে 'আত্মন্' শব্দ। আবার পরমদেবতা ফুটে উঠছেন আদিত্যরূপে, এও লক্ষ্য করবার মত। উপনিষদের প্রথমে যেমন কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ের কথা আছে, তেমনি শেষ মন্ত্রে আছে বিনম্র ভক্তির কথা। সুতরাং গীতায় শ্রীকৃষ্ণপ্রতিপাদিত কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমাহারের উদ্দেশ এখানেও পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর কাণ্বশাখার পাঠ অনুসরণ করেছেন। এখানেও তা-ই করা হচ্ছে।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এবা বশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—পূর্ণ ওই, পূর্ণ এই। পূর্ণ হতে পূর্ণ উপচে পড়ছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়েও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকছে।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

এই শান্তিপাঠটি শুক্লযজুর্বেদেরই বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটি ব্রাহ্মণ হতে নেওয়া। সেখানে তার পরেই আছে, 'ওম্ খং বা আকাশ ব্রহ্ম। আকাশ পুরাণ। অকাশে আছে বায়ু বা প্রাণ।'[১] অনন্ত শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে আছে অনন্ত প্রাণ। এই প্রত্যক্ষাবগম আনন্ত্যের রহস্যসান্দ্রতা দিয়ে উপনিষদের শুরু।

শান্তিপাঠে যে-পূর্ণতার কথা আছে, তার আশ্রয় মনন নয়—বোধি। মনের ধর্ম বিকল্পনা, এদিকে-সেদিকে ছড়ানো টুকরা-

টুকরা জ্ঞানকে জুড়ে তবে সে অখণ্ড জ্ঞানের একটা ধারণায় পৌঁছয়। আর বোধিজ প্রত্যয় তিমিরান্তক সূর্যোদয়ের মত একটা উদ্‌ভাস। এই উদ্‌ভাস ঈশোপনিষদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাই তাকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত না করে সংহিতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ণতা কামনার বিপরীত, অভাবজনিত বেদনা ও বিক্ষেপ তার মধ্যে নাই। উপনিষদের ভাষায় চিত্ত তখন অপিপাস অকামহত শ্রোত্রিয়ের চিত্ত।[২] তার আদি-অন্ত জুড়ে এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। এই প্রশান্তি যদি জাগ্রতের সহজ প্রত্যয় হয়, তাহলে তার মধ্যে চেতনার পরাক্ বৃত্তিতে জাগে ভূমার বৈপুল্য এবং প্রত্যক্ বৃত্তিতে আত্মমহিমার বোধ। পূর্ণতার এই লক্ষণগুলি মিলিয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশকে তার উপমানরূপে গ্রহণ করে বলা হয়েছে, 'পুরুষের বাইরে যে-আকাশ তা নেমে এসেছে অন্তরে আর অন্তরের আকাশ ঘনীভূত হয়েছে হৃদয়ে। সে হল পূর্ণ এবং অপ্রবর্তি' অর্থাৎ প্রবর্তনাহীন এক আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠার আধার।[৩]

আকাশ অপ্রবর্তী—এ তার একদিকের পরিচয়। কিন্তু এই আকাশেই আবার সূর্য ওঠে, তার মধ্যে শক্তি আর জ্যোতি পারার মত টলমল করতে থাকে। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মক্ষোভ।[৪] এই ক্ষোভই বিসৃষ্টি—যা অক্ষরের ক্ষরণ,[৫] 'অদঃ' হতে সহস্ররশ্মির পরিকীর্ণতায় 'ইদম্'এর বিচ্ছুরণ। এই অদঃ আর ইদম্এর যুগনদ্ধতায় আকাশের অখণ্ড পরিচয়।

অদঃ—ওই, যেন বিপ্রকৃষ্ট, যেন দূরের, যেন সব ছাপিয়ে। পুংলিঙ্গ 'অসৌ' নয়, ক্লীবলিঙ্গ 'অদঃ'—পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈতবর্জিত এক সর্বনাম সন্মাত্রের দ্যোতক। ওই অদঃ ব্রহ্ম ; আর এই ইদম্ আত্মচৈতন্যের ক্ষেত্র। তার আশ্রয় ওই। আকাশের পূর্ণতাকে আশ্রয় করে আমার আত্মচৈতন্যের পূর্ণতা—আমার, তোমার, এর, ওর, তার। আলোর সমুদ্রে স্ফটিককন্দুকের মত আমি বসে আছি।

আমার বাইরের আলো 'অদঃ', আর ভিতরের আলো 'ইদম্'। দুই-ই পূর্ণ। ওর পূর্ণতা এর বিন্দুতে সংহত, এর পূর্ণতা ওর সিন্ধুতে বিস্ফারিত। আলোয়-আলোয় মেশামিশি, দুয়ে একাকার। যিনি অদঃ, তিনিই আবার ইদম্।

অপ্রাকৃত ভূমিতে অদঃ আর ইদম্এ ভেদ নাই, কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে একটুখানি ভেদ আছেও। এই ভেদটুকু না থাকলে পূর্ণতায় উল্লাস দেখা দিত না। সে-উল্লাসের স্বরূপ হল এক পূর্ণ হতে আরেক পূর্ণের উদঞ্চন বা উছলে উঠে উপচে পড়া। অদঃ আর ইদম্এর মধ্যে দেখা দিল অন্যোন্যসম্ভাবন বা সম্বন্ধতত্ত্বের বিলাস। বিলাস উভয়ত—একটি পূর্ণতার আরেকটি পূর্ণতার দিকে উথলে উঠে উপচে পড়া। তাঁর আলো উথলে উঠে আমাকে পূর্ণ করে উপচে পড়ছে যখন, তখন আমারও আনন্দ উথলে উঠে তাঁর পূর্ণতায় উপচে পড়ছে। এই অবসর্পণ আর উৎসর্পণে যে-অন্যোন্যসঙ্গমের লীলা, তা এক উদ্‌বর্তুল পূর্ণতারই পরিস্পন্দ। উপরে-নীচে দুটি সমুদ্রের গভীরে তখন পূর্ণতার নির্বাক প্রশমের স্তব্ধতা, আর দুয়ের অন্তরিক্ষে যেন ঈষদান্দোলিত ভরাঘটের ছলছলানি।

ওই পূর্ণের যে অনিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিয়ে এই আধারকে পূর্ণ করে তোলা, তাতে তো তাঁর ক্ষয় নাই। এ যেন এক 'অক্ষীয়মাণ উৎস', যা শতধারায় নির্ঝরিত হয়েও৬ আতটপূর্ণতায় টলমল করছে। অসীম অব্যক্তের মধ্যেই সীমিত ব্যক্তের প্রকাশ —সংযোগ-বিয়োগে উপচয় আর অপচয়ের কথা তার বেলাতেই উঠতে পারে, অব্যক্তের বেলায় নয়।

আবার যা অংশ, তাও পূর্ণ এবং আনন্ত্যের বাহন। যেমন, দেহ সান্ত হয়েও অনন্ত ভাব ও শক্তির আধার হতে পারে। এই আধারে 'অণোরণীয়ান্' ও 'মহতো মহীয়ান্'এর ভাবনা যে-আনন্ত্যের বোধ আনে, তা ত্রৈমানিক। অপ্রাকৃত দেহচেতনায় শক্তির বিচিত্র

উল্লাসের অন্তুবিদ্ধতার ফলে আরেকটি মান যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে সে হবে একটি চাতুর্মানিক পূর্ণ আনন্ত্যের বোধ। বৃহদারণ্যকে কৌরব্যায়ণীপুত্র একেই বলেছিলেন আকাশ ও প্রাণের মিথুনীভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি।[৭] এই দেহেই সে-উপলব্ধিতে অদঃ আর ইদম্এর অন্যোন্য-আপ্যায়নে জিজীবিষার পরম সার্থকতা। তাইতে বোধির পূর্ণতা। তার এক কোটিতে যেমন অসীমের মধ্যে সীমার অনিঃশেষ নিলয়ন, তেমনি আরেক কোটিতে 'পূর্ণম্ অদঃ'র মধ্যে 'পূর্ণম্ ইদম্'এর একটুখানি আভাসনে সীমার মধ্যে অসীমের উচ্ছলন।

শান্তিপাঠে উদ্‌ঘোষিত বোধির এই বৃহজ্জ্যোতিকে আলোচ্য উপনিষৎপাঠের সময় সঞ্জীবিত রাখতে হবে আমাদের মধ্যে।

প্রস্তাবনা

আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঈশোপনিষদ সঙ্কলিত হয়েছে শুক্লযজুর্বেদের শেষযুগে। বৈদিক ভাবনা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ততদিনে একটা সংহত রূপ নিয়েছে। এ-প্রকল্পের মূল্য যা-ই হ'ক, এই উপনিষদটিতে যে বহুযুগের নানা বিরোধী ভাবনাকে একটা সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করা হয়েছে তা সহজেই চোখে পড়ে।

প্রথম বিরোধ ভোগের আর ত্যাগের, প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তির বিরোধ। এ-বিরোধ চিরাগত। ভোগে প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এর মূলে রয়েছে তার জৈবধর্মের তাগিদ। তাইতে তার মধ্যে দেখা দেয় বিত্তৈষণা, উপকরণসঞ্চয়ের স্পৃহা বা ধনগৃধ্নুতা। কিন্তু কাম ও অর্থের অবাধ চরিতার্থতা খুঁজতে গেলে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রেয়ের আকর্ষণ যত প্রবলই হ'ক না কেন, মানুষের স্বভাবের মূলে শ্রেয়ের আকর্ষণও আছে। তাইতে কাম আর অর্থের এষণাকে তার বাঁধতে হয় ধর্মের শাসনে। উপনিষদে ব্রহ্মচর্য অধ্যয়ন তপ যজ্ঞ ও দান এই কয়টি ধর্মস্কন্ধের

উল্লেখ আছে।[১] এদের অনুশীলনে মানুষের মধ্যে জাগে বিবেক ও আত্মসচেতনা, যা তাকে পশু হতে পৃথক করেছে। আত্মসচেনতা প্রবল হলে সত্তার গভীরে জাগে বিবিক্ত পুরুষের বোধ, যা মানুষকে করে অমৃতের অভিযাত্রী বা মুমুক্ষু। প্রবৃত্তির সংবেগের তখন মোড় ফেরে নিবৃত্তি বা অন্তরাবৃত্তির দিকে। নচিকেতা-চিত্তে জাগে বিদ্যার অভীপ্সা।

এই বিবিদিষা হতে দেখা দেয় আরেকটা বিরোধ—জ্ঞান ও কর্মের, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের বিরোধ। ভিতরের টান প্রবল হলে বাইরটা আলুনি লাগে। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, মানুষ তখন বেশি কেটে জ্বলে যায়, তার জাহাজ কালাপানিতে গিয়ে আর ফেরে না বা ফিরতে চায় না। যদি না চায়, অথচ ফিরতে হয়, তাহলেই আবার নতুন করে বিরোধের সৃষ্টি হয়—সংসারের সঙ্গে মোক্ষের, ভবের সঙ্গে নির্বাণের, অভ্যুদয়ের সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের। কোথায় তার সমাধান?

অর্থ আর কামকে ধর্মের শাসনে যদি বাঁধি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের সমাধানে জীবন সমৃদ্ধ হয়ে দেখা দিতে পারে অভ্যুদয়—যাতে বিত্তৈষণার পরিতর্পণ। বিত্তৈষণার আন্তর প্রতিরূপ হল লোকৈষণা—আভাস্বর ব্রহ্মলোকে উত্তরণের উদগ্র পিপাসা। কিন্তু তারও পরে আছে লোকোত্তরের সর্বনাশা হাতছানি। আদিত্য-প্রভায় ঝলমল আকাশের পরেও আছে নিস্তারক অমানিশার সান্দ্র অন্ধকারে আকাশের নীরূপ রূপ। বিত্তৈষণা এনে দিয়েছিল প্রেয়কে, লোকৈষণা শ্রেয়কে আর এই লোকোত্তরের এষণা আকাশের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে আনল নিঃশ্রেয়সকে—যার বাড়া শ্রেয় আর নাই। যে এই অরূপের অতলে ঝাঁপ দেয়, সে বুঝি আর রূপের কূলে ফিরতে পারে না।

প্রেয় আর শ্রেয়ের দ্বন্দ্বের মত শ্রেয় আর নিঃশ্রেয়সের এই আরেক দ্বন্দ্ব: কোন্‌টি পরমার্থ—সৎ না অসৎ, পূর্ণতা না শূন্যতা,

দিন না রাত? এদেশের দর্শনে এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ হয়েছে মীমাংসায় আর তর্কে। মীমাংসা বৈদিক আর্যের দর্শন, আর তর্ক অবৈদিক আর্যের। মীমাংসার পূর্ব এবং উত্তর দুটি ধারাই মোটের উপর ইতিবাদী এবং জীবনরসিক। পূর্বমীমাংসাতে পাই ঋষিজীবনের আদর্শ, জীবনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার স্বাভাবিক পরিণাম হল গার্হস্থ্যকে অনুবিদ্ধ করে এবং তার অবিরোধে অথচ তাকে ছাপিয়ে গার্হস্থ্যোত্তর জীবনদর্শন—উত্তরমীমাংসা যার ধারক। মীমাংসা জীবনকে প্রত্যাখ্যান না করলেও তর্কপ্রস্থানের জীবনবিমুখীনতা ক্রমে তার ধারাকেও প্রভাবিত করেছে। একই সমাজে ভাবনার দুটি বিভিন্ন ধারা পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে প্রভাবিত করবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

যাজ্ঞবল্ক্যের আবির্ভাবের সময় দুটি ধারা সুস্পষ্টভাবে পরস্পরের মুখামুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জীবন ও প্রবচন হতে মনে হয়, তিনি দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় এনে এক অখণ্ড সম্যক্-দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ যেন শ্রীকৃষ্ণের মতই, যে সর্বতোমুখ বৈবস্বত যোগ কালের প্রবাহে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে আনবার মহান্ প্রয়াস। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মতই তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের জীবনে রূপ ধরল না।

মীমাংসার মূলে আছে শ্রদ্ধা এবং বোধি; আর তর্কের মূলে তপঃ এবং বুদ্ধি। শ্রদ্ধা অনায়াস, সহজের আবেশে, আলোর মত সে ফুটে ওঠে; আর তপে আয়াস আছে, অরণিমন্থনে তার আগুন জ্বলে। মনের উজানে বিজ্ঞান। বোধি বিজ্ঞানের পরিণাম, আর বুদ্ধি মননের। মন সংশয় করে, তর্ক করে—এ স্বাভাবিক। বোধি তর্ক করে না, সহজে সত্যকে পায়। বুদ্ধির ঐশ্বর্য যদি বোধির অনুগত হয়, তাহলেই দর্শনের সার্থকতা। যাজ্ঞবল্ক্যে এইটি হয়েছিল। ঔপনিষদ-ভাবনার উত্তুঙ্গতা চরমে পৌঁছেছিল তাঁর মধ্যে। তারপর বোধির আলো

ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল, তার প্রতিভাস নিয়ে জেগে রইল বুদ্ধি। বুদ্ধির দ্বারা লোকোত্তরকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে লোকের সঙ্গে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরাধিকারিরূপে আমরা তাই পাই গৌতমবুদ্ধকে। সেই ধারা বেয়ে বহুকাল পরে মধ্যযুগে দেখা দিলেন শঙ্করাচার্য, যাঁকে বলতে পারি বুদ্ধের ভাবনায় প্রভাবিত যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁর মতবাদের বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও লোক আর লোকোত্তরের বিরোধ ভারতীয় দর্শনে আজও দুস্তর হয়ে আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ আর যাজ্ঞবল্ক্য দুজনেই আমাদের জীবনে পরাভূত।

যে-অখণ্ডদর্শন যাজ্ঞবল্ক্যের অভীপ্সিত ছিল, তা আসবে বোধি থেকে, পূর্ণতার বোধ থেকে। এ পূর্ণতা অদঃ আর ইদম্ দুয়েরই পূর্ণতা। শিশুবট আদিত্যের বৃহজ্জ্যোতিতে বৃহৎ হয়ে নিজেকে উচ্ছিত করবে আকাশের পানে, প্রসারিত করবে দিকে-দিকে। সে তখন বোধিদ্রুম বা সম্বুদ্ধচেতনার উর্ধ্ববুধ্ন বনস্পতি। এই হল যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনদর্শন এবং এই উপনিষদেরও মূল কথা।

গ্রন্থারম্ভ

ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্॥ ১

—ঈশের দ্বারা উদ্ভাসিত করতে হবে এই-সব, যা-কিছু জগতীতে জঙ্গম। তাইতে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করো। লোলুপ হয়ো না কারও ধনের প্রতি।

এই মন্ত্রের সঙ্গে তার পরের মন্ত্রটি মিলিয়ে নিলে একটি অখণ্ড অনুভবের আদর্শ পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে সম্যক দৃষ্টি সম্যক ভোগ আর সম্যক কর্মের ত্রিপুটী। মানুষের জীবনে তার বাইরে আর-কিছুই নাই।

প্রথম মন্ত্রে বলা হচ্ছে, ঈশের দ্বারা জগতের সব-কিছুকে উদ্ভাসিত দেখতে হবে। তা-ই দৃষ্টির বিশুদ্ধি। আর, কোনও

লুব্ধতা না রেখে ঈশবাসিত সেই জগৎকে ভোগ করতে হবে ত্যাগের দ্বারা। তা-ই ভোগের বিশুদ্ধি।

প্রথমেই পাচ্ছি তিনটি তত্ত্ব—ঈশ জগতী আর জগৎ। ঈশ পরমচৈতন্য, জগতী তাঁর শক্তি; আর তাঁর বিভূতি জগৎ বা জীব। তিনটিতে ওতপ্রোত সম্পর্ক।

এখানে যাঁকে **ঈশ্** বলা হয়েছে, সংহিতাতে তিনি 'ঈশান'। পরে তিনিই হয়েছেন সর্বজনীন 'ঈশ্বর'। কিন্তু এই শব্দটি ঋগ্‌বেদে নাই—আছে অথর্ব এবং যজুর্বেদে, তবে পরমপুরুষের পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে নয়। অথর্বসংহিতার পুরুষসূক্তে 'অমৃতত্বস্যেশানঃ' হয়েছেন 'অমৃতত্বস্যে.শ্বরঃ'। সেখানেও প্রয়োগটি পারিভাষিক নয়।[১] 'ঈশ্' 'ঈশান' বা 'ঈশ্বরে'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যিনি প্রশাসক বা নিয়ামক। 'ঈশ্' এখানে পরমপুরুষের সংজ্ঞা। এই উপনিষদেরই চতুর্থ পঞ্চম এবং অষ্টম মন্ত্রে তাঁর স্বরূপ এবং তটস্থ, নির্বিশেষ এবং সবিশেষ দুটি লক্ষণই দেওয়া হয়েছে। তিনি অনির্বচনীয় অদ্বৈত, আত্মবিচ্ছুরণে বিশ্বাতিগ হয়েও বিশ্বাত্মক, স্পন্দ এবং অস্পন্দের সমাহার, বিশ্বের আধার এবং বিধাতা। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এক অক্ষরের প্রশাসন এবং অন্তর্যামিত্বের কথা বলেছেন।[২] প্রশাসনের অর্থ বিশ্বের সব-কিছুকেই নির্ঋতির পরিকীর্ণতায় উদ্দাম হতে না দিয়ে এক ঋতচ্ছন্দের মধ্যে ধরে রাখা। অন্তর্যামিত্ব এই প্রশাসনেরই আরেক রূপ। যিনি সবার অন্তরে গুহাহিত থেকে তাদের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যাঁকে কেউ জানে না অথচ সবাই যাঁর শরীর, তিনিই অন্তর্যামী। এই প্রশাসন এবং অন্তর্যামিত্বই ঈশ্বরের ঈশনা (mastery)। এই তাঁর পরিভূ ক্ষরস্বভাব বা আত্মবিচ্ছুরণ। অথচ স্বরূপত তিনি 'অক্ষর'—আকাশের মত অপ্রবর্তী পূর্ণতায় অস্পন্দ। তিনি অক্ষর হয়েও ক্ষর—নেতিমুখে আকাশ হয়েও ইতিমুখে আবার প্রাণ। দুটি

আপাতবিরোধী তত্ত্বের সমন্বয়ে তিনি অনির্বচনীয়। অক্ষর অন্তর্যামী এবং প্রশাস্তা—এই তিনটি সংজ্ঞার সমবেত ভাবনাতেই তিনি ঈশ্বর।

মাণ্ডূক্যোপনিষদে ব্রহ্মোপলব্ধির প্রসঙ্গে বিশেষ করে ঈশ্বরের কথা পাই।[৩] সেখানে আছে, এই সব-কিছুই ব্রহ্ম। আবার এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মা চতুষ্পাৎ। প্রথম পাদে তিনি জাগরিতস্থান বৈশ্বানর, দ্বিতীয় পাদে স্বপ্নস্থান তৈজস, তৃতীয় পাদে সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ। তিনিই সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বযোনি অন্তর্যামী। চতুর্থ পাদে তিনি প্রপঞ্চোপশম শান্ত শিব এবং অদ্বৈত।

আত্মার মত ব্রহ্মও চতুষ্পাৎ। বহিঃপ্রজ্ঞতায় তিনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ বিরাট্ পুরুষ। অন্তঃপ্রজ্ঞতায় তিনি সর্বাগ্রবর্তী ভূতপতি হিরণ্যগর্ভ। আবার প্রজ্ঞানঘনতায় তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর।[৪] এই তিনটি বিভাব যথাক্রমে তাঁর বস্তুরূপ ভাবরূপ এবং শক্তিরূপ। তাকেও ছাপিয়ে তাঁর চিদ্‌রূপ, যা ওই তিনটিতে অনুস্যূত হয়ে আছে। শুধু চতুর্থ পাদ ব্রহ্ম নয়—চারটি পাদ মিলিয়েই চতুষ্পাৎ বা চারপো'তে পূর্ণব্রহ্ম। বস্তু হতে চিৎএর দিকে, জাগ্রত হতে তুরীয়ের দিকে উজিয়ে যাবার সময় 'নেতি নেতি' করে একেকটি ভূমি ছাড়িয়ে যেতে হয়। তার ফলে প্রপঞ্চোপশম এবং অক্ষরসমাপত্তি। কিন্তু সেখান থেকে ভাটিয়ে আসবার সময় প্রপঞ্চোপশম কৈবল্যের ঐশ্বর্য প্রপঞ্চোল্লাসের স্ফুরত্তায় বস্তুকেও চিদ্‌বিলাসে অপরূপ করে তোলে। তখন বস্তু ভাব এবং শক্তি সবই ব্রহ্ম, সবই আত্মা।

এই প্রপঞ্চোল্লাসই অন্তর্যামিরূপে অক্ষরের ঈশানা, তাঁর ঋতচ্ছন্দা প্রশাস্ত্রী শক্তির বিচ্ছুরণ। এই শক্তিকে এখানে বলা হয়েছে জগতী। জগতী বেদে একটি ছন্দের নাম। মুখ্য সাতটি ছন্দের শেষটি হল জগতী। ঋক্‌সংহিতায় জগতী বিশ্বদেবতার ছন্দ।[৫] ওর প্রতি পাদে বারোটি করে অক্ষর আছে। তাই ওটি

আদিত্যেরও ছন্দ, কেননা আদিত্যের সংবৎসরব্যাপী ভুবনপরিক্রমা সম্পূর্ণ হয় বারো মাসে। 'ছন্দঃ' শব্দের তিনটি অর্থ—ইচ্ছা আবির্ভাব এবং আচ্ছাদন। দেবতার ছন্দ হল তাঁর অন্তর্গূঢ় ইচ্ছার উল্লাসে সৃষ্টির চারিদিকে একটি আলোর নীহারিকা রচনা করা যা 'জ্যোতির্জরায়ু'[৬] হয়ে তার প্রশাসন করবে। আদিত্য বা বিশ্ব-চৈতন্যের ছন্দ জগতীতে তাই ভুবনেশ্বরী মহাশক্তির অভিব্যঞ্জনা আছে। আদিত্য অদিতির বিভূতি। অদিতি লোকোত্তর মহাশক্তি—অখণ্ডিতা এবং অবন্ধনা। তিনিই জগতী হয়েছেন। ঈশ তখন অদিতির অবিনাভূত 'বরুণ' বা অব্যক্ত আনন্ত্যের সেই মহারহস্য যা সবাইকে 'আবৃত' এবং প্রবর্তিত করেও সবার 'অতিষ্ঠাঃ'।

এই ঈশ এবং জগতীর যুগনদ্ধতা হতেই জগৎ। দ্বিবচন হতে বহুবচন। ঈশ আর জগতী পরমচৈতন্য এবং মহাশক্তি। জগৎ সেই চিৎ-শক্তির জঙ্গমত্ব বা গতি বা বিচ্ছুরণ—মহাব্যোমের আদিত্য-হৃদয় হতে স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মিজালের মত। একেকটি রশ্মি যেন 'জীর অসুঃ'[৭]—একেকটি জীবের জীবন বা জগৎ। কদম্ব-কেশরের মত তারা বিধৃত রয়েছে ঈশাধিষ্ঠিত জগতীতে। প্রত্যেকটি জগৎ বা জীবের জীবনের পিছনে রয়েছে এই জগতী, ভূতের পিছনে ভুবন। সবাইকে আবিষ্ট করে রয়েছে অন্তর্যামী পরমচৈতন্যের ঈশনা।

এই জগতীতে যে-জগৎ অর্থাৎ ভুবন-বিথার শক্তির সমুদ্রে যে বিচিত্র বিভূতির ছন্দ-আন্দোলন, তাকে বাস্য বা উদ্‌ভাসিত দেখতে হবে এক অক্ষরের ঈশনার দ্বারা। ণিজন্ত বস্ ধাতু হতে 'বাস্য'। বস্ ধাতুর সাধারণ অর্থ 'বাস করা' অথবা 'আচ্ছাদন করা'। তাছাড়া আরেক অর্থ 'আলো দেওয়া'—যা থেকে বৈদিক 'বসু' দেবতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা, সবিতা 'বিশ্বাবসু দেবগন্ধর্ব'। বসু আবার ধনও, কিন্তু বোঝায় আলোকবিত্তকে—সংহিতায় যার এষণাকে বলা হয়েছে আমাদের পুরুষার্থ। 'বাস্যম্' বলতে তিনটি অর্থই নেওয়া

যায়। তবুও শেষেরটিই এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা ঋক্‌সংহিতার একাধিক জায়গায় ণিজন্ত বস্ ধাতুর এই অর্থই খাটে, বিশেষত এটি যখন আধারস্থ অগ্নির বেলায় প্রযুক্ত হয়েছে।

সব-কিছুর মূলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, সব-কিছুকে দেখা তাঁরই অন্তর্যামী শক্তি ও চৈতন্যের শরীররূপে—এই হল দৃষ্টির সত্য। এরই প্রকাশ ছান্দোগ্যোপনিষদে ঋষি শাণ্ডিল্যের মহাবাক্যে: 'সর্বং খল্ ইদং ব্রহ্ম'।[৯] কিন্তু পরাক্-দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মানুভবের আশ্রয় হল প্রত্যক্-দৃষ্টিতে আত্মানুভব, যার কথা একটু পরেই বলা হবে। তাঁকে যদি এই দেহের দীপঙ্কর ভূত-ভব্যের 'ঈশান' এক অধূমক জ্যোতীরূপে আমার জীবনে ও জগতে অনুভব করতে পারি, তবেই বিশ্বভুবনের ভূতে-ভূতে দেখব তাঁরই অমৃত জ্যোতির দীপালি। তখন এখানকার সব-কিছুই হবে তাঁর দ্বারা আবৃত, আপূরিত এবং উদ্‌ভাসিত।

এই হল দৃষ্টির বিশুদ্ধি। কিন্তু আমাদের মধ্যে দৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভোগ এবং কর্মও। ভোগে আনন্দের এবং কর্মে শক্তির প্রকাশ। জ্ঞান আনন্দ এবং শক্তি তিনটিই পুরুষের স্বভাবধর্ম। ঈশ্বরের আবেশে যেমন দৃষ্টি বিশুদ্ধ হবে, তেমনি ভোগ ও কর্মও বিশুদ্ধ হবে। মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমত ভোগবিধির অনুশাসন: ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ।

ভোগ জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। তার উচ্ছেদে বা নিগ্রহে (repression) জীবন সার্থক হয় না, হতে পারে সংযমনে (control) এবং ঊর্ধ্বায়নে। ভোগের এক মেরুতে আছে গৃধ্নুতা (greed) বা লোলুপতা, আরেক মেরুতে ত্যাগ (sacrifice)। একটি আসুরী প্রবৃত্তি, আরেকটি দৈবী সম্পদ। ব্রাহ্মণে আছে, অসুর আত্মম্ভরি, সে আহুতি দেয় নিজের মুখে;[১০] আর দেবকাম মানুষ আহুতি দেয় হব্যবাহন অগ্নিতে। প্রাকৃত-জীবনে এ-দুটি বৃত্তির দ্বন্দ্ব সপ্তশতীর ভাষায় জীবনের শতাব্দীব্যাপী দ্বন্দ্ব।

আসুরী গৃধ্নুতা প্রবল হলে জীবনে এবং সমাজে যে-বিপর্যয় দেখা দেয়, তার ফলাও বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নাই—এযুগে বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। কোনও চালাকি দিয়ে এ-গৃধ্নুতাকে ঠেকানো যাবে না, যদি না মানুষ নিজেকে ধর্মের শাসনে স্বেচ্ছায় না বাঁধতে শেখে। আর সে-ইচ্ছাও তার জাগবে না, যদি তার ঐহিক দৃষ্টির রূপান্তর না ঘটানো যায়।

ধর্মস্কন্ধের কথা আগে বলেছি। তার মধ্যে দৃষ্টিবিশুদ্ধির প্রয়োজক হল ব্রহ্মচর্য অধ্যয়ন এবং তপ। আর গৃধ্নুতার প্রতিষেধক হল দান ও যজ্ঞ। দুয়ের সমুচ্চয় হল ত্যাগ। সর্বভূতের হিতের জন্য, সর্বভূতের সুখের জন্য যে-ত্যাগ, তা দান। আর দেবতার উদ্দেশে যে-দ্রব্যত্যাগ বা আত্মাহুতি, তা যজ্ঞ।

দিয়ে সুখ আছে, এ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। খেয়ে যে-সুখ, তার চাইতে বেশী সুখ খাইয়ে। এই পরার্থপর সুখের সংস্কার যদি দৃঢ়মূল হয়, তাহলে সহজেই বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, ভোগলোলুপতায় ভাটা পড়ে, তৃষ্ণার বিষদাঁত ভেঙে যায়। তখন ব্যাসদেবের ভাষায় বলতে গেলে মনে হয়, তৃষ্ণাতর্পণের যে-সুখ, তা তৃষ্ণাক্ষয়ের সুখের এক আনাও নয়। এ-সুখ অপিপাস অকামহত শ্রোত্রিয়ের আত্ম-সুখ, যা বাইরের উপর নির্ভর করে না, আবার বাইরের মাত্রা-স্পর্শকেও যা রূপান্তরিত করে ব্রহ্মসংস্পর্শে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষায়, যিনি হৃদয়ের আকাশে শয়ান বিজ্ঞানময় সর্বেশ্বর মহান আত্মা, তাঁকে জানবার একটি সাধন হল দান।[১১] নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে আমরা তাঁকেই পেতে পারি, যিনি সবার অন্তর্যামী।

আবার যদি মানি—বা জানি, তিনি শুধু সবার অন্তরেই নন, সবাইকে ছাপিয়ে সবার বাইরেও তিনি, তাহলে তাঁকে পাওয়ার সাধন হবে যজ্ঞ—যা ত্যাগেরই আরেক রূপ। যজ্ঞ আত্মাহুতি :

প্রবুদ্ধ চেতনার আগুনে আমার বা আমি বলে যা-কিছু সব অর্পণ করা, প্রতিমুহূর্তে বলতে পারা 'ইদং তব ন মম'—এ তোমার, আমার নয়—এ তুমি, আমি নয়। এ-আত্মদান তাঁর কাছ থেকে তখনই ফিরে আসে প্রসাদ হয়ে, যজ্ঞশিষ্ট অমৃত হয়ে—যা 'তেন ত্যক্তম্'। এই প্রসাদ বা অমৃতের সম্ভোগেই ভোগের চরিতার্থতা। এ কেবল নিজের লুব্ধতার ক্ষুদ্রতার গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়ানো—গুটি কেটে প্রজাপতির রঙিন পাখা নিয়ে আকাশের আনন্দে অনিবাধ সঞ্চরণ। বৈদান্তিকের ভাষায়, বিষয় তখন নিবর্তিত না হলেও তার আনন্দ রূপান্তরিত হয় ব্রহ্মের আনন্দে। ভূমার সুখে অল্পের সুখ নিষ্প্রভ হয়ে যায় বলে তার প্রতি আর মোহ বা আসক্তি থাকে না।

ভোগের ত্যাগ তাহলে বর্জনের দুরাগ্রহ নয়, দান বা যজ্ঞের ভিতর দিয়ে তার রূপান্তরসাধন। এক্ষেত্রে যা নিরুদ্ধ করতে হবে, তা হল গৃধ্নুতা বা প্রবৃত্তির সংবেগ—শকুনির মত বিষয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ধর্ম আমাদের এই রাস টানতে শেখায়। তারই অনুশাসনে চিত্তে জাগে তটস্থতা। তা-ই হল ত্যাগের মূলে। যা আসবার তা আসুক, আমি তাকে কখনও কামনা করি না। তাই, সে এলেও আমি তার সঙ্গে জড়িয়ে যাই না। আর তাইতে আমি তার যথার্থ উপযোগ করতে পারি—হয় সর্বভূতহিতকল্পে বা দানে, অথবা দেবোদ্দেশে বা যজ্ঞে। দুয়েই আমি বৃহৎ হই। আর এই বৃহৎ হওয়ার যে-আনন্দ, তা-ই আমার ত্যাগের দ্বারা অনুবিদ্ধ দিব্যভোগের ভূমানন্দ।

কুর্বন্ এবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

—কর্ম করেই এখানে বাঁচতে চাইবে একশ' বছর। তুমি যখন এই, (তখন) এর আর অন্যথা নাই। নর যে, তাতে কর্ম (কখনও) লিপ্ত হয় না।

মন্ত্রটির সহজ অর্থ, কর্ম করতে-করতেই একশ' বছর বেঁচে থাকবার সঙ্কল্প করবে। এই যদি হয় পুরুষের স্বভাব বা জীবনের ধর্ম, তাহলে এর আর অন্যথা নাই। সত্যকার পুরুষ যে, কর্ম কখনও তাতে লিপ্ত হয় না বা তার বন্ধনের কারণ হয় না।

আগের মন্ত্রটিতে আমরা পেয়েছি পুরুষের দ্রষ্টৃত্বের এবং ভোক্তৃত্বের আদর্শ। এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে তার কর্তৃত্বের কথা। তাহলে দুটি মন্ত্র মিলিয়ে আমরা সাংখ্যভাবনার সূত্রটি পেয়ে যাচ্ছি।

সাংখ্যের পুরুষ প্রাকৃত ভূমিতে দ্রষ্টা ভোক্তা এবং কর্তা। কিন্তু পুরুষের বিশুদ্ধ স্বরূপ হল অভোক্তা এবং অকর্তা দ্রষ্টার কৈবল্য। ভোগ আর কর্ম পড়ছে অপরা প্রকৃতির এলাকায়। প্রাকৃত জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ আর কর্মে জড়িয়ে যাচ্ছি, সুখ-দুঃখ আর ইচ্ছা-দ্বেষের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হচ্ছি। এই আন্দোলনের শেষ পরিণাম দুঃখই। এই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির জন্য প্রকৃতি হতে আমাদের বিবিক্ত হতে হয় বৈরাগ্য এবং নৈষ্কর্ম্যের সাধনার দ্বারা। বিবিক্ত পুরুষ ভোক্তাও নন, কর্তাও নন—তিনি কেবল দ্রষ্টা। এই সিদ্ধান্ত এবং তার অনুকূলে সাধনা হল উজিয়ে যাবার পথে। অধ্যাত্মজীবনের প্রথমে, যতক্ষণ আমরা অপরা প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছি, ততক্ষণ এর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই শেষ নয়।

প্রাকৃত পুরুষ ভোগ আর কর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে কেবল দ্রষ্টা হতে পারলেই তার মুক্তি। কিন্তু পরমপুরুষের বেলায় এ-বিধান খাটে না। প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি, তাঁর 'স্বগুণে নিগূঢ় দিব্য আত্মশক্তির'[১] বিচ্ছুরণ। সুতরাং তাঁর বেলায় বিবিক্ত দ্রষ্টৃত্বের প্রশ্ন ওঠেই না। গীতার ভাষায়, তিনি উপদ্রষ্টা হয়েও আবার অনুমন্তা ভর্তা এবং 'ভোক্তা মহেশ্বর'।[২] এই শেষের দুটি বিশেষণ তাঁর দিব্য ভোগ এবং দিব্য কর্মের জ্ঞাপক। এই রূপে তিনি যেমন পিণ্ডে তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মভাবে সর্বত্র আবিষ্ট। এই উপনিষদেই পরে

তার 'পরিভূ' এবং 'পরিগন্তা' রূপেরও পরিচয় পাব, শুনব এখানকার পুরুষ এবং ওখানকার পুরুষের একত্তার কথা। পরমপুরুষের মত আমাদেরও মধ্যে দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বে শেষপর্যন্ত কোনও ভেদ থাকবে না—এমনিতর একটি অখণ্ড জীবনদর্শনের উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে।

জীবনদর্শনের প্রাচীন সংজ্ঞা হল 'দৃষ্টি'। দুটি দৃষ্টি আছে—মিথ্যাদৃষ্টি আর সম্যক্-দৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, অহন্তায় সঙ্কীর্ণ; জীবনকে এবং জগৎকে সে সমগ্রভাবে দেখে না, দেখে নিজের গরজে—টুকরা-টুকরা করে। সম্যক্-দৃষ্টি আদিত্যপ্রভার মত প্রশান্ত প্রসন্ন উদার দৃষ্টি—তা আপনাতে আপনি থেকে সবার উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, বহুর বৈচিত্র্যকে সে একের সৌষম্যের অনুগত করে। এই দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে এবং সবার মধ্যে আমরা সেই একককেই দেখি, যিনি 'সর্বেশ্বরঃ'; সেই ঈশ্বরের দ্বারা সব-কিছুকে দেখি আবিষ্ট এবং উদ্ভাসিত। এই দৃষ্টির বিশুদ্ধিতে আমাদের ভোগও বিশুদ্ধ হয়, আমরা তাকে গ্রহণ করিতে পারি গৃধ্নু হয়ে নয়—প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রসাদরূপে।

কিন্তু ভোগের সঙ্গে আমাদের মধ্যে আবার জড়িয়ে আছে কর্মও। ভোগে আমরা শক্তিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি, আর কর্মে তাকে বিকীর্ণ করি। মিথ্যাদৃষ্টি যেমন ভোগকে আবিল করে, তেমনি কর্মকেও—দুয়েরই পরিণাম হয় উত্তেজনা প্রমত্ততা এবং অবশেষে অবসাদ। কিন্তু সম্যক্-দৃষ্টির প্রসন্নতা কর্মকে রূপান্তরিত করে ঈশনায়, আত্মশক্তির স্বচ্ছন্দ বিচ্ছুরণের সামর্থ্যে। আমাদের আত্মপ্রকৃতি তখন হয় ঈশপ্রকৃতিরই অনুরূপ। তাঁরই মত আমরা তখন দ্রষ্টৃত্বে চিৎস্বরূপ, ভোক্তৃত্বে আনন্দস্বরূপ আর কর্তৃত্বে শক্তিস্বরূপ।

মন্ত্রটিতে একটি কথা আছে 'জিজীবিষা' (will to live), যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সংহিতায় এ-ভাবনা খুবই সুলভ। সেখানে শতায়ু হয়ে 'দেবহিত আয়ু'কে সম্ভোগ করবার কথা নানা জায়গায় নানাভাবে আছে।[৩] উপনিষদে আত্মা শুধু অমৃত নন, তিনি 'বিজরো বিমৃত্যুঃ'; ব্রাহ্মণে আছে অমৃতাহুতির ফলে যজমানের হিরণ্যশরীর হওয়ার কথা; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে, পঞ্চভূতে যোগগুণ প্রবৃত্ত হলে যোগাগ্নিময় শরীরের জরা ব্যাধি বা মৃত্যু হয় না।[৪] এ-সমস্তেরই মূলে রয়েছে বেদের আদিত্যোপসনা। আদিত্য দিক্‌চক্রবাল থেকে মধ্যগগনে উত্তীর্ণ হলে তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ। তারপর থেকেই শুরু হয় তাঁর জ্যোতির অবক্ষয়। আমাদের জীবনেও পরিপূর্ণ যৌবনের পর আসে জরা যার পরিণাম মৃত্যু। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, মাধ্যন্দিন সূর্যকে কিছুতেই হেলতে দেওয়া হবে না—এই ছিল আদিত্যোপাসকদের পুরুষার্থ। এর মধ্যে যে একটা প্রবল জিজীবিষা আছে, তা রূপ ধরেছে উপনিষদের প্রাণ-ব্রহ্মের উপাসনায়। আমরা আজ তাকে ভুলে গেছি, কিন্তু 'বৈদিকাঃ প্রাণবাদিনঃ' এমন-একটা প্রসিদ্ধি মধ্যযুগ পর্যন্ত শৈবদর্শনে বেঁচে ছিল।[৫] **জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ**—এই অনুশাসনের মধ্যে শুনতে পাই বিজর বিমৃত্যু আদিত্যরূপী প্রাণের প্রচোদনা: নিজের ভিতর থেকে এক প্রচণ্ড সঙ্কল্পের বিস্ফারণ ঘটিয়ে আমাদের বাঁচার মত করে বাঁচতে হবে একশ' বছর; দেহের জরা ও প্রাণের অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের মনোজ্যোতি যেন প্রোজ্জ্বল থাকে শেষ পর্যন্ত।

আর বাঁচতে হবে **কুর্বন্নেব কর্মাণি**—কর্ম করতে-করতেই। এখানে 'এব' বোঝাচ্ছে অবধারণ: কর্ম করতেই হবে, তাকে ছাড়া চলবে না। মনে হয়, এ যেন কোন বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ।

আর্যভাবনায় তর্ক ও মীমাংসা দুটি ধারার কথা আবার স্মরণ

করিয়ে দিই। তার্কিকরা নিঃশ্রেয়সকে পরমপুরুষার্থ বলে মনে করেন, কিন্তু বেদোক্ত কর্ম বা দেবোপাসনাকে তার সাধন বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা ঋক্‌সংহিতার 'অদেব অযজ্ঞ'দের দলে পড়েন। ঋষি গৃৎসমদের একটি সূক্তে এঁদের প্রতি আক্ষেপ আছে।[৬] এই মতের চরম পরিণাম একধরনের অকর্মবাদে, যাতে সবরকমের কর্মকে ত্যাগ করাই জীবনের আদর্শ বলে ঘোষণা করা হত। বৌদ্ধ সাহিত্যের তীর্থকদের পরিচয়ে এই মতবাদীদের সন্ধান পাওয়া যায়। পূবদেশের কীকটে এই মতের প্রাধান্য ছিল, এমন ইঙ্গিত ঋক্‌সংহিতাতেও আছে।[৭]

কর্মসন্ন্যাসকে যাঁরা সাধনরূপে গ্রহণ করেন, সাধারণভাবে তাঁদের অধ্যাত্মসিদ্ধির লক্ষ্য হল 'বিনাশ' বা চেতনার পরিনির্বাণ। তার বৈদিক প্রতিরূপ হল 'অসদ্ ব্রহ্ম' বা বারুণী শূন্যতা। সংহিতায় উপনিষদে নানাভাবে এরও উদ্দেশ পাওয়া যায়।

হয়তো শেষপর্যন্ত সব-কিছু শূন্যতাতেই মিলিয়ে যায়। জলে জল মিশে যাবার মত মৃত্যুতেই জীবনের পর্যবসান—হ'ক না সে মৃত্যু বৈবস্বত। হয়তো বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যে বলেছিলেন, 'সব ছাপিয়ে যাওয়ার পর আর সংজ্ঞা থাকে না'[৮]—সেই পরম নৈঃশব্দ্যে অবগাহনই সত্তার চরম ও পরম সত্য। তা-ই যদি হয়, তাহলে যম আর বরুণের সেই লোকোত্তর স্বধার নিলয়ে[৯] ভোগ বা কর্ম কিছুই তো থাকে না। তাহলে একদিন যা সবার শেষে সুনিশ্চিতভাবে আসবেই, জীবনের গোড়াতেই তাকে বরণ করে নিই না কেন?

কিন্তু এ-যুক্তিতে ফাঁক আছে, সম্যক্-দর্শনের নিষ্পক্ষতা এবং পূর্ণতা এর মধ্যে নাই। পরম তত্ত্বকে কেবল অসৎ বা কেবল সৎ কোনটাই বলা চলে না। সে একাধারে অসৎ এবং সৎ, মরণ এবং জীবন দুই-ই। জীবনের মূলে যে-গতি, তা তারই গতি; আবার

মৃত্যুতে গতির যে-নিবৃত্তি, তা তারই প্রশমস্বভাব। জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভোগও আছে, কর্মও আছে। ত্যাগের দ্বারা প্রশাসিত ভোগ যেমন বিশুদ্ধ, নির্লেপের দ্বারা প্রশাসিত কর্মও তেমনি বিশুদ্ধ। একটিতে ঈশের প্রসাদ, আরেকটিতে তাঁর ঈশনা। দুইই দেহহিত বা দেবেষিত। অক্ষর হতেই বিশ্বের ক্ষরণ, অসৎ হতেই সৎএর প্রজনন।[১০] এই অসৎ বা অক্ষরে সমাপন্ন হওয়াই বৈবস্বত মৃত্যুর তাৎপর্য। তার প্রদ্যোতে জীবনকে যদি উদ্‌ভাসিত রাখতে পারি, তাহলে কর্ম হবে নৃত্যের ছন্দ, ঈশনার সহজ বিচ্ছুরণ।

এই কর্ম কি? এখানে কর্মের অনুশাসন পাচ্ছি শুক্লযজুর্বেদের পরিশেষরূপে। সুতরাং অতি সঙ্গতভাবেই বলা যেতে পারে, কর্ম যজ্ঞ। কিন্তু তাহলে যজ্ঞ সংজ্ঞাটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে নিতে হবে। ঋক্‌সংহিতায় যজ্ঞ সেই 'দেবকর্ম' যা 'নাক' বা আদিত্যেরও ওপারে 'বিশোক' লোকের প্রাপ্তির সাধন।[১১] তা যে কেবল বিধিতন্ত্রিত ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য, তা নয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঘোর আঙ্গিরস শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, মানুষের সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ, সে যা-কিছু করে সবই যজ্ঞাঙ্গ।[১২] শতপথব্রাহ্মণে বিহিত গৃহস্থের নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞেরও[১৩] মূলে এই কথা। এই দৃষ্টিতে উৎসর্গভাবনার দ্বারা ভাবিত কর্মমাত্রেই যজ্ঞ। মানুষ 'অপিপাস' হয়ে তার অনুষ্ঠান করতে পারে অথবা তার অনুষ্ঠানেই অপিপাস হয়। তা-ই হয় তার পরম পুরুষার্থসিদ্ধির প্রয়োজক বা পরিণাম।

এবং ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি। 'এবং ত্বয়ি'র অর্থ হতে পারে: এই যদি তোমাতে থেকে থাকে; অথবা, এই যদি তুমি হয়ে থাক। বাক্যটির তাৎপর্য হল, ত্যাগের দ্বারা প্রশাসিত ভোগের প্রসন্নতা আর দেবেষিত জিজীবিষা যদি তোমার মৌলধর্ম হয়ে থাকে,

তাহলে যজ্ঞভাবিত কর্ম তোমার অবধারিত কর্তব্য, তার আর অন্যথা হতে পারে না।

কর্মের ঝামেলা চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত এবং মলিন করে, তাই কর্ম বন্ধনের কারণ—নিঃশ্রেয়সবাদীর এই ভয়। কিন্তু চিত্তকে মলিন করে আসক্তি—কর্ম নয়। আত্মম্ভরিতা গৃধ্নুতা বা উপকরণসঞ্চয়ের ত্বরাগ্রহবশত যে-কর্ম, তা বস্তুতই কৃষ্ণ। চিত্তের প্রসন্নতাতে তা অঞ্জন লেপে দেয়। কিন্তু দেবোদ্দেশে বা ভূতহিতার্থে অনুষ্ঠিত যে-কর্ম, তা শুক্ল। তার ফল অধ্যাত্মপ্রসাদ বা শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তের স্বচ্ছতা। কর্তা তখন অপিপাস নিরঞ্জন এবং নির্লিপ্ত। তাঁর নির্লেপের পরিচয়—কর্মের আচরণে বা পরিণামে তাঁর আকাশবৎ অক্ষুব্ধ প্রসন্নতায়। তখন তিনি কর্তা হয়েও অকর্তা। আবার কখনও কর্ম তাঁর আত্মশক্তির স্বতোনির্ঝরণ—আকাশ হতে আদিত্যরশ্মির বিচ্ছুরণের মত। সে তখন সিদ্ধচেতনার বিসৃষ্টি—অক্ষরের ক্ষরণ। পুরুষ তখন অকর্তা হয়েও কর্তা। এমনি করে কিছু করেও করেন না এবং না করেও করেন বলে তিনি কৃৎস্নকর্মকৃৎ অথচ নির্লিপ্ত।

এখানে এই নির্লিপ্ত কর্তার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নর। 'নরে'র প্রাচীন রূপ হল 'নৃ'। সংহিতায় এই শব্দটির বহু প্রয়োগ আছে—মানুষ এবং দেবতা উভয়ের বেলায়। যাস্ক তাঁর নিরুক্তিতে বলছেন, 'নরা নৃত্যন্তি কর্মসু'।[১৪] গীতায় ভগবান্ বলছেন, তিনি 'পৌরুষং নৃষু।'[১৫] সংহিতায় শব্দটির প্রয়োগে সর্বত্র রয়েছে একটি বলিষ্ঠ ভাবের দ্যোতনা। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, নির্লিপ্তের কর্ম নরের কর্ম, তার মধ্যে আছে নৃত্যের ছন্দ, পৌরুষের উল্লাস যা পরমদেবতার আত্মবিসৃষ্টির সগোত্র। তা কখনও বন্ধন হতে পারে না।

তাহলে উপনিষদের প্রথম দুটি মন্ত্রে পাচ্ছি একটি পূর্ণায়ত জীবনদর্শনের রূপরেখা। তার এই অনুশাসন: ঈশের দ্বারা সমস্ত

জগৎকে উদ্ভাসিত দেখতে হবে। সব-কিছুকে তাঁর প্রসাদরূপে ভোগ করতে হবে অলোলুপ হয়ে, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত থেকে। শতায়ু জীবনের উল্লাস নিয়ে কর্ম করে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এই দৃষ্টি, এই ভোগ, এই কর্মের আদর্শেই জীবনের পরিপূর্ণতা।

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা.বৃতাঃ।
তাংস্ তে প্রেত্যা.ভিগচ্ছন্তি যে কে চা.ত্মহনো জনাঃ॥ ৩

—অসূর্য হচ্ছে সেইসব লোক অন্ধতমিস্রায় যারা ছাওয়া। তাদেরই দিকে তারা চলে যায়, যারা নাকি আত্মঘাতী জন।

দৃষ্টি ভোগ আর কর্মের বিশুদ্ধিতে প্রতিবুদ্ধ করতে হবে জীবনকে, এই ছিল আগেকার মন্ত্র দুটির তাৎপর্য। এই প্রতিবোধ আসে আত্মসচেতনতা হতে। আলোচ্য মন্ত্রে তারই বিবৃতি।

'অসুর্য' এই পাঠ কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন দুই শাখাতেই। শব্দটি আর কোনও উপনিষদে পাওয়া যায় না। তাইতে মনে হয়, এটি একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। 'অসুর্য' কিনা অসুরসম্বন্ধী ; তা যে 'অসূর্য' বা সূর্যবিহীন, এমন একটা ইঙ্গিত শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।[১] কিন্তু এ-তাৎপর্য গৌণ মনে করবার কারণ আছে। মন্ত্রের 'আত্মহা' শব্দের আপাতদৃষ্টিতে অর্থ হল, আত্মসচেতনতা নাই বলে যাকে বলা যেতে পারে 'আত্মঘাতী'। কিন্তু শব্দটির আরেক অর্থ হতে পারে, যে আত্মাকে স্বীকার করে না অর্থাৎ যে 'অনাত্মবাদী'। প্রেতির পর সে যেখানে যায়, সে হল অন্ধতমসে আবৃত অসুর্য লোক বা বারুণী রাত্রির শূন্যতা। এ হল একান্তভাবে 'অসম্ভূতি' বা 'বিনাশে'র উপাসনা, যা এ-উপনিষদের অভিপ্রেত নয়। ঋক্-সংহিতায় বরুণ বিশেষ করে 'অসুর', ব্রাহ্মণে তিনি 'রাত্রি' বা অব্যক্তের দেবতা। মন্ত্রে বর্ণিত 'অন্ধ তমঃ'কে বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন 'প্রেতির পর অসংজ্ঞা'।[২]

'আত্মহা' শব্দের প্রচলিত অর্থ ধরলে মন্ত্রটির তাৎপর্য হবে, সারাজীবন যারা আত্মসচেতন না থেকে মোহের ঘোরে কাটিয়ে দেয়, 'প্রেতি' বা মৃত্যুর পর তারা এক মহামোহের অন্ধতমিস্রাতেই ঢলে পড়ে। সম্মূঢ় প্রাকৃত মানুষের এই দশা। জীবনে সে চলে-ফেরে প্রায়শ বেহুঁশ হয়ে। যেটুকু তার হুঁশ, তা অহংএর—আত্মার নয়; কেননা তার দৃষ্টির মোড় ফেরানো বাইরের দিকে, অন্তরের দিকে নয়। আবৃত্ত-চক্ষু না হলে মানুষ আত্মাকে জানতে পারে না। সে তখন 'আত্মন্বী'[৩] বা আত্মসচেতন নয়, সে আত্মহা। তার জীবনের অন্ধতার জের চলে মৃত্যুর অন্ধকারে—এই তার নিয়তি।

কিন্তু এ-নিয়তি সবার নয়। এরই মধ্যে 'কোটিকে গোটিক' হলেও লোকোত্তর শ্রদ্ধার আবেশে নচিকেতার মত কেউ কেউ অমৃতের পিপাসা নিয়ে জেগে ওঠে। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায়, তার নিজের মধ্যেই রয়েছে এক 'অজো ভাগঃ',[৪] এক অজর অমৃত অধূমক জ্যোতির শিখা—যা নিত্য লেলিহান হয়ে উঠছে মিত্র আর বরুণের ধামের দিকে। এই চিদগ্নির বোধই হল আত্মবোধ। অগ্নিহোত্রী হয়ে একে অহরহ জাগিয়ে রাখাই আর্যের জীবনব্রত।

এই আত্মবোধ রয়েছে সৃষ্টির মূলে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাই, 'ব্রহ্মই আদিতে এইসব হয়ে ছিলেন। তিনি আত্মাকেই জানলেন, "আমি হচ্ছি ব্রহ্ম" এই বলে।'[৫] ব্রহ্মের এই অহংবোধ সংক্রামিত হয়েছে সবার মধ্যে। তাইতে গীতার ভাষায় জীব তাঁর সনাতন 'অংশ' বা অংশু—আদিত্যমণ্ডল হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির মত। রশ্মির এক প্রান্তে চৈতন্য অহন্তায় সংহত, আরেক প্রান্তে ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু দুয়েরই সামান্যধর্ম হচ্ছে অস্মিতা বা স্বধা বা আপনাতে আপনি থাকা।

এই অস্মিতা বা স্বধাকে আমরা যখন হারিয়ে ফেলি, তখনই

আমরা 'আত্মহা'। প্রাকৃত ভূমিতে চেতনার উন্মেষ হয় অস্তিতার বোধ নিয়ে, অস্মিতার বোধ জাগে তার প্রত্যাঘাতে অনেক পরে। প্রথমটায় সবই আছে তা বুঝি, কিন্তু আমি আছি কি না বুঝি না। অস্তিতার কাছে অস্মিতা তখন পরাভূত। তারপর থেকে অস্তিতার বিরুদ্ধে অস্মিতার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার যে নিরন্ত প্রয়াস, তা-ই হল আমাদের জীবন। অস্মিতা যদি বৃহৎ হয়ে অস্তিতাকে আত্মসাৎ করতে পারে, তাহলেই জীবনের সার্থকতা। উপনিষদে তাকেই বলা হয়েছে ব্রহ্মাত্মভাব এবং সর্বাত্মভাব—সংহিতায় যার অনুরূপ হল দেবতাতি এবং সর্বতাতি।

'জগত্যাং জগৎ'। জগতীর মায়ায় জগতের অস্তিতা যখন আমাদের অস্মিতাকে গ্রাস করে, তখন আমরা আত্মহা—অনাত্মতার অন্ধতমিস্রায় লীন। কিন্তু জগৎ তো শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই একটা জগৎ নয়, তাকে ছাপিয়ে তারও গভীরে আছে বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় জগৎ —আছে মিত্রজ্যোতির প্লাবন, তারও পরে বারুণী শূন্যতার রাহুগ্রাস। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায়, আদিত্যস্থ হিরণ্ময়পুরুষের সামনে রয়েছে 'শুক্লং ভাঃ', আর তার পিছনে রয়েছে 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্'। ও-দুয়ে উৎক্রমণ এবং অবগাহন আমাদের পুরুষার্থ।[৬] কিন্তু তাও তো অস্মিতার কাছে লোকোত্তর অস্তিতার একটা দ্বন্দ্বাহ্বান। চেতনার বিস্ফারণ ঘটিয়ে আদিত্যবর্ণ জ্যোতিতে এবং অবর্ণ শূন্যতায় আমি উত্তীর্ণ হতে চাই নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার অস্মিতাকে হারিয়ে নয়। সেখানেও আমি 'স্বধারঃ' থেকে অস্তিত্বকে আত্মসাৎ করতে চাই অস্মিতা দিয়ে। আত্মভাবের বিস্ফারণের সঙ্গে-সঙ্গে অতিস্থিতির অকূলতায় তার প্রলয় চাই না, চাই পরিব্যাপ্তির ঘনীভবন। বারবার হয়তো বানের জলে সব ভেসে যাবে, তবুও সেই 'অপ্রকেতং গহনং গভীরম্'এ[৭] পলি পড়ে-পড়ে আত্মস্থিতির চর জাগবে এবং ওই আত্মস্থিতি হবে সেই অতিস্থিতিরই

নির্যাস, তার স্বয়ম্ভু চিৎকেন্দ্র। এ যদি না হয়, তাহলে লোক হতে লোকোত্তরে গিয়েও আমি হব আত্মহা, আমার 'প্রেতি' বা স্বোত্তরণ (self-exceeding) আমায় উত্তীর্ণ করবে এক অন্নুপাখ্য অন্ধতমিস্রার কূলে। আত্মস্থিতির অভাবে আমি তখন অবশ হয়ে তলিয়ে যাব বিদেহলয় বা প্রকৃতিলয়ের অতল সঙ্কর্ষণে।[৮]

বৈরাগ্য এবং নৈষ্কর্ম্যের প্রতি প্রবল আগ্রহবশত সর্বনাশা প্রলয়ের পথে উধাও হয়ে যাওয়া—আর্যভাবনার এই একটা ধারাও এদেশে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ছিল। গৌতম বুদ্ধের মধ্যে আমরা তার পরিনিষ্ঠিত রূপটি দেখতে পাই। তাঁর কাছে ভোগ নাই, কর্ম নাই, ঈশ্বর নাই—এমন-কি আত্মাও নাই। সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করল এক অপ্রমেয় নাস্তিত্ব, সব আলো নিবে গেল এক অনালোক শূন্যতায়। এ-অনুভব যে মিথ্যা, তা নয়। সংহিতায় এবং উপনিষদে তার দিকে অনেক ইশারাই পাওয়া যায়। যা অসৎ, যা রাত্রি, যা 'শূনম্ আপেঃ', যার রহস্য পরম ব্যোমের অধ্যক্ষও 'ৱেদ ন ৱেদ ৱা', যা অবিদিত অসংজ্ঞ অনিরুক্ত, যেখানে 'ন সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্'[৯] তাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই মহতী বিনষ্টিই কি অনুভবের শেষ কথা? তাহলে কোথা হতে এই বিসৃষ্টি? কেন এই জিজীবিষা? সে কি উজিয়ে গিয়ে আবার ভাটিয়ে আসবার জন্য নয়? যা অসৎ, তা-ই কি সৎএর জনিতা নয়? রাত্রির চোখেও কিসের আলো, তার হৃদয়ে দুলছে কালকলনাহীন কোন্ 'সমুদ্রো অর্ণৱঃ'? যেখানে কিছুই ভায় না, সেই অনালোকের এ কোন্ অনুভা?

তাকেও তো অস্বীকার করতে পারি না। আমার অস্মিতার প্রলয় যায় মধ্যে, তার অস্তিত্বের অপলাপ আমার সাধ্য নয়। বুদ্‌বুদ্ সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, কিন্তু সমুদ্র থাকেই। এবং তার অস্তিতা হয় এক পরম অস্মিতার অবিনাভূত। আবার বৃহদারণ্যকোপনিষদের সেই উক্তি স্মরণ করি, 'ব্রহ্ম আত্মাকেই জানলেন,

অহং ব্রহ্মাস্মি বলে।[১০] আর তাইতে তিনি সব হলেন।[৯] এক পরম অস্মিতা পরিকীর্ণ হয়ে পড়ল বহু অবম অস্মিতায়। এক পরম আত্মভাবের আবেশে বহু হল আত্মন্বী। কিন্তু তারা যদি তাদের উৎসে উজিয়ে গিয়ে আত্মভাবকে বিসর্জন দেবার আগে সেই পরম আত্মভাবের উদ্‌ভাসে উদ্‌ভাসিত না হয়, তাহলে তারা হবে বস্তুতই আত্মহা, তাদের প্রেতিতে তারা উত্তীর্ণ হবে অন্ধতমিস্রায় আবৃত অসূর্য লোকেই—বরুণের অব্যক্তজ্যোতির্ময় 'অসূর্য লোকে'র রহস্য না জেনে।[১১]

আত্মভাবের প্রলয়ে এই যে মহতী বিনষ্টি, তাহতে নিজেকে বাঁচাতে হবে। বারুণী স্বধায় স্বধাবান হয়ে প্রেতির চরমে অসূর্য লোকের অব্যক্ত জ্যোতির প্লাবনেও আত্মজ্যোতিকে অনির্বাণ রাখতে হবে। 'মৈত্রম্ অহঃ' আর 'বারুণী রাত্রিঃ'র অস্তিত্বের যে-যৌগপদ্য, তা সম্পুটিত থাকবে এক পরম অস্মিতায়। সে-অস্মিতা ঈশের হয়েই আমার।

প্রথম দুটি মন্ত্রে আত্মভাবের উল্লাস জিজীবিষায়—ঈশানুগত দৃষ্টি ভোগ আর কর্মের বিশুদ্ধিতে। আর এই মন্ত্রে ব্যতিরেক-মুখে আত্মভাবের প্রতিষ্ঠা—লোকোত্তরণ প্রেতির চরমে, অতিস্থিতিতে। তাও ঈশেরই অনুগত—পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে ইতি-নেতির সমন্বয়ে যাঁর অখণ্ড পরিচয়। তিনটি মন্ত্রে জিজীবিষার সঙ্গে প্রেতিকে,[১২] জীবনের সঙ্গে মরণকে মিলিয়ে নিয়ে অস্তিত্বের একটি পূর্ণায়ত বিবৃতি।

অনেজদ্ একং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্ দেবা আপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ।
তদ্ ধাবতোঽন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

—কাঁপছেন না (এমন) এক, মনের চাইতেও (তিনি) দ্রুতগতি, এঁকে পেলেন না দেবতারা, আগে ছুটছেন (বলে)। (অনির্বচনীয়) সেই ধাবমান আর-সবাইকে ছাড়িয়ে যান দাঁড়িয়ে থেকে; তাঁর মধ্যে অপ্‌দের মাতরিশ্বা করেন নিহিত।

যিনি জগতের ঈষান, আমার 'আত্মা হন্তর্যাম্য.মৃতঃ[১]', যাঁর আবেশে আমার দৃষ্টি ভোগ ও কর্মের দিব্য রূপান্তর এবং জিজীবিষার চরিতার্থতা, তাঁর সামান্য পরিচয় পেলাম প্রথম তিনটি মন্ত্রে। এবার পাঁচটি মন্ত্রে তাঁর বিশেষ পরিচয়—আত্মভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে।

ঈশ যখন জগৎ ও জীবনে অনুস্যূত প্রশাস্তা, তখন তিনি ক্ষরণশীল। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আবার অক্ষরও। অক্ষর-স্বভাবকে আশ্রয় করেই তাঁর মধ্যে দুটি গতি—একটি ভাটিয়ে যাওয়া বা ক্ষরণ, আরেকটি উজিয়ে আসা বা অক্ষরে প্রত্যাবর্তন। আমাদের জীবনে তা-ই জিজীবিষা-ও প্রেতির, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যুগল ছন্দ। এই নামা-ওঠার উর্ধ্বে তাঁর অপ্রবর্তী আকাশের স্তব্ধ মহিমা। এবার তার কথা।

প্রথম মন্ত্রের 'ঈশ' শব্দটি পুংলিঙ্গ। কিন্তু এই মন্ত্রে তাঁকে লক্ষিত করা হচ্ছে ক্লীবলিঙ্গ 'তৎ' শব্দ দিয়ে। বেদে তৎ অনির্বচনীয়ের জ্ঞাপক। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে,[২] সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম 'সৎ' এবং 'ত্যৎ' (ত্যম্) দুইই। সৎএর সার হল মূর্ত আদিত্য, আর ত্যৎএর সার আদিত্যমণ্ডলস্থ অমূর্ত পুরুষ। ঋক্‌সংহিতায় পরমতত্ত্ব 'একং সৎ' এবং 'একং তৎ' দুইই। 'একং সৎ' বহু দেবভাবের উৎস, আর 'একং তৎ' সব-কিছুর সমাহারে আবির্ভূত একটি 'রপুঃ' বা আলোর ঝিলিমিলি, যা অন্তাকাশের গহনে 'ঋতের দ্বারা অপিহিত মিত্রাবরুণের ধ্রুব ঋতে'র রহস্য।[৩] ঈশ এই 'একং তৎ'। সংহিতার ভাষায় ঈশরূপে তিনি 'একো দেবঃ,' অপুরুষবিধতায় 'একং সৎ', আবার অনুপাখ্যতায় 'একং তৎ'।

এই 'একং তৎ' অনেজৎ বা অস্পন্দ, অকম্পন। যেন ওই অনুচ্ছলিত পূর্ণতায় অপ্রবর্তী আকাশ। যেন 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যে.কঃ'—এই সন্ধ্যার আকাশে বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয়ে আছেন দ্যুলোকে, পূর্ণ করে আছেন সব-কিছু।[৪]

অক্ষরের এই স্তব্ধতা জগতের মূলে, জীবনের গঙ্গোত্রীতে। অন্তরাবৃত্ত বোধের দ্বারা তাতে অবগাহন করতে হবে।

কিন্তু এই আকাশবৎ পরিব্যাপ্ত স্তব্ধতার বোধ নিষ্প্রাণ নয়। কোনও বোধই নিষ্প্রাণ নয়। বোধ আর প্রাণ, চৈতন্য আর শক্তি অবিনাভূত। বৃহদারণ্যকোপনিষদ বলেন, যা ত্যৎ, তা-ই 'য়ৎ' কিনা জঙ্গম। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে ব্রহ্মক্ষোভের কথা—আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে টলটলে তেজের মত।[৫] তাই স্তব্ধতাতে গতির অভাব নয়, তার সংহরণ—যেমন যোগে চিত্তের নিরোধাভিমুখীনতায়। সংহরণের ফলে স্থিতিতে আর গতিতে দেখা দেয় একটা বিষমানুপাত। যেমন চক্রের আবর্তনে কেন্দ্রের দিকে কোনও বিন্দুর গতিবেগ যত মন্থর হয়, পরিধির দিকে ততই তা হয় দ্রুত।

তাইতে তৎস্বরূপ যেমন আত্মস্থিতিতে অনেজৎ, তেমনি আবার বিশ্বসম্ভূতিতে মনসো জবীয়ঃ। 'জব' একটি বৈদিক সংজ্ঞা, অর্থ গতি বা শক্তিস্পন্দ—যা জগতের ধর্ম, জগতীর স্বভাব। যেমন বাইরের জগতে গতি আছে, তেমনি আছে অন্তর্জগতেও—বেদে যার নাম 'মনসো জবঃ', মুণ্ডকোপনিষদে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে 'মনোজবা' নামে অগ্নির তৃতীয় জিহ্বা বলে।[৬] আমার জগতে দেহের জবনের চাইতে মনের জবন দ্রুততর ; মনের জবনের চাইতে দেবতার জবন আরও দ্রুত। আর আত্মার জবন ছাপিয়ে যায় মনকেও, দেবতাকেও —কেননা আত্মা অনেজৎস্বভাব। তিনি স্তব্ধ, নিস্পন্দ। এই একটা আপাতবিরোধ। তার মীমাংসা চাই।

জবন শক্তিস্পন্দ—অধিভূতদৃষ্টিতে যেমন বাইরে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তেমনি অন্তরে। প্রথমটায় এ-জবনকে মনে হয় নির্ঋত (chaotic) বা এলোমেলো; কি তার 'অর্থ' বা লক্ষ্য তা বোঝা যায় না। ক্রমে অর্থের আভাসনে তা ঋতময় হয়। বস্তুশক্তির নীহারিকা সংহত হয় ভূতরূপে, একটা সুস্পষ্ট ব্যাকৃতিতে বা কায়সংস্থানে। অন্তরেও তেমনি প্রথমটায় দেখি, আকারপ্রকারহীন বিক্ষিপ্ত মননের কুয়াসা, বৌদ্ধেরা যাকে বলতেন 'চিত্তের জবন'। অর্থের চেতনায় বা কামনায় সে-জবন একাগ্র হয়। আমি যখন বুঝতে পারি আমি কি চাই, কামনা রূপান্তরিত হয় 'ব্রতে' বা সঙ্কল্পে, আর মনের জবন হয় রৈখিক এবং দ্রুততর। কিন্তু অর্থ বা কামনার বস্তু যতক্ষণ বাইরে থাকে, ততক্ষণ প্রাপ্তির বাধায় বা বিলম্বে মনোজবন কেবলই ব্যাহত হয়। তার পরিণাম শোক বা চিত্তের জ্বালা।

বস্তুত অর্থ বাইরে নয়, অন্তরে। ভোগের সার্থকতা গৃধ্নুতায় বা ইন্দ্রিয়ারামতায় নয়, আত্মারামতায়। বস্তুকে যখন চাই, তখনই সঙ্গে-সঙ্গে ভাবরূপে তাকে আমার মধ্যে পাই। এই ভাবই দেবতা। যা-কিছু বাস্তব হয়ে বাইরে আছে, তা-ই ভাবরূপে অন্তরে দিব্য হয়েও আছে। একসময় পরাক্-বৃত্ত মন প্রত্যক্-বৃত্ত হয়, তার বাইরের জবন পরাবর্তিত হয় অন্তরের দিকে। এ তার এষণার রূপান্তর—বিত্তৈষণা হতে লোকৈষণায়। চেতনার একেক ভূমি একেকটি লোক। এবার চাই ভূলোক হতে লোকোত্তরে উৎক্রমণ, দেবযানের জ্যোতিঃসরণি বেয়ে পার্থিব চেতনার উৎসর্পণ।

চেতনার এই অন্তরাবৃত্তি আর উৎক্রমণ মনোজবন হতেও উৎকৃষ্ট এবং ক্ষিপ্র। একেই এখানে বলা হয়েছে দেবতাদের ধাবন এই ধাবন বা জবন মনোজবনেরই মত রৈখিক, কিন্তু সে-রেখা ভূতলের সঙ্গে সমান্তরাল নয়—সে 'অতিরোহী'[৭] বা উৎসর্পী।

ঋক্‌সংহিতার ভাষায়, সে যেন পর্বতের এক সানু হতে আরেক সানুতে আরোহণ করে দেখতে পায়, তার কত করবার আছে, আর তাইতে তার মধ্যে জাগে অর্থের চেতনা।[৮] অতিরোহণের সঙ্গে-সঙ্গে চেতনার দিগন্ত প্রসারিত হয়, রৈখিক গতির সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যাপ্তি। সংহিতার ভাষায়, আমার মধ্যে দেবতা তখন 'উরুগায়' বা 'উরুক্রম'—আদিত্যের উদয়নের মত তিনি লোক হতে লোকোত্তরে উঠছেন আর ছড়িয়ে পড়ছেন। সমস্ত অনুভবটি তখন যেন অনন্তে বিস্ফারিত একটি আলোকবিম্বের মত বর্তুল—আত্মানুভব তার অক্ষরেখা।

কিন্তু এই বিস্ফারণেরই-বা চরম চরিতার্থতা কোথায়? যাকে চেয়ে ছড়িয়ে পড়া, শেষপর্যন্ত গিয়েও দেখি, তবুও সে নাগালের বাইরে। পেয়েও তাকে পাওয়া হয় না, জেনেও জানা হয় না। ছড়িয়ে যাওয়ার পর আবার দেখা দেয় গুটিয়ে আসার পালা। কিন্তু ছড়িয়ে পড়া বৃথা হয় না। এবার ঘরে ফিরে দেখি, বাইরে যাকে খুঁজেছিলাম, সে এতক্ষণ ঘরেই বসে ছিল। ছান্দোগ্যোপনিষদ উপমা দিয়েছেন, পায়ে-দড়ি-বাঁধা একটি পাখির। সে দিকে-দিকে উড়ে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আবার ফিরে আসে নিজের সেই দাঁড়টিতে। সে তখন নিজেকে পায় এবং নিজের মধ্যেই সবকিছুকে পায়।[৯] সমস্ত জবনের এই পরিণাম। সে যদি অপ্রবুদ্ধ মনোজবন হয়, তবে তার পরিণাম অবসাদ—জাগ্রতের কোলাহলের পর সুপ্তির মত। সে তো নিজেরই সেই অব্যক্ত উৎসের মধ্যে ফিরে আসা। আর এ যদি প্রবুদ্ধ মনের জবন হয়—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে হৃদয় দিয়ে অব্যক্ত হতে ব্যক্তের তক্ষণ[১০]—তারও পরিণাম আত্মানুভবের অক্ষবিন্দুতে ফিরে এসে এক জ্যোতির্ময় প্রশান্তিতে অবগাহন, বৃহদারণ্যক যাকে বলেছেন 'সম্প্রসাদ'।[১১] তখনই বোঝা যায়, তৎস্বরূপ কেন অনেজৎ, কেন তিষ্ঠৎ—বহুধাবিচ্ছুরিত জবনের কেন্দ্রে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন।

অথচ তিনি পূর্বম্‌, অর্ষৎ—সমস্ত জবনের আগে-আগে ছুটে চলেছেন। রথ আগে-আগে ছুটে চলে আর তারই টানে পিছনে ছুটে চলে ধুলার ঝড়—কিন্তু তার নাগাল পায় না। তেমনি মনের জবন, আর দেবতাদের ধাবন। এ তাঁরই জবন। জগতীতে এবং জগতে বেগ সঞ্চারিত হয় তাঁরই আত্মানুভবের কেন্দ্র হতে। যেমন বীজশক্তির বিস্ফারণ বনস্পতিতে। কিন্তু বনস্পতি সান্ত, বীজশক্তি অনন্ত। বনস্পতি যা হয়েছে এবং যা হতে পারত, বীজশক্তি সেই ভূত আর ভব্য দুয়েরই ঈশান হয়ে তার 'মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি'।[১২] এই তাঁর প্রাগ্‌ভূত অর্ষণের রহস্য, যা একাধারে ঋতচ্ছন্দা বেধা এবং ক্রান্তদর্শী।[১৩]

এই বিশ্ববীজভূত আত্মকেন্দ্রে মাতরিশ্বা অপো দধাতি। অধ্যাত্ম-দর্শনের পাশাপাশি এ একটি অধিদৈবত দর্শন। যা আমাতে ঘটছে, তা বিশ্বেও ঘটছে। তা হল এক অক্ষীয়মাণ অক্ষরের উৎস হতে শতধারায় বিশ্বের ক্ষরণ। এই ক্ষরণ যাঁর মধ্যে প্রথম প্রত্যয়গোচর হয়, তিনি হলেন 'মাতরিশ্বা'; অক্ষর তাঁর আধার বা অধিষ্ঠান। মাতরিশ্বা সংজ্ঞার অর্থ 'মায়ের মধ্যে যিনি কেঁপে ওঠেন'। ঋক্‌সংহিতায় তাঁর পরিচয়, 'মাতরিশ্বা যদ্‌ অমিমীত মাতরি'—মায়ের মধ্যে যিনি রূপ নিলেন।[১৪] মাতা অদিতি—আকাশের অবিনাভূতা অখণ্ডিতা অবন্ধনা সেই মহাশক্তি, যিনি 'দেবতাময়ী'[১৫], আদিত্যগণ যাঁর তনয়।[১৬] সৃষ্টির আকূতিতে তাঁর হৃদ্যসমুদ্রের যে উচ্ছ্বসন, তা-ই মাতরিশ্বা। মাতরিশ্বা বিশ্বপ্রাণ।

আর অপ্‌ সেই প্রাণের নির্ঝরণ। সাতটি অপ্‌ বা সপ্তসিন্ধুর কথা সংহিতায় আছে। অধিলোকদৃষ্টিতে তারা ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ এবং সত্য—এই সাতটি লোক। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ ও সৎ—চেতনার এই সাতটি ভূমি। মাতরিশ্বার দ্বারা নির্বাহিত এই সাতটি অপ্‌ প্রথম মন্ত্রের 'জগৎ'।

মাতা 'জগতী'। 'একং তৎ' অনেজৎ-রূপে অধিষ্ঠান, ঈশরূপে প্রশাস্তা।

ঈশ্বররূপে যিনি জগৎ ও জীবনের প্রশাস্তা, ভূতে-ভূতে আত্মা-রূপে যিনি অন্তর্যামী, সর্বাতিশায়িরূপে তিনিই আবার অনির্বচনীয় এক অক্ষরও। অক্ষররূপে তিনি বিশ্বের বহুধা বিসৃষ্টির অধিষ্ঠান।

আবার দেখছি এই জঙ্গম বিশ্বও তিনি। অক্ষর এবং ক্ষর, এক আর বহু—দুইই তিনি। প্রত্যগনুভবে যিনি অত্যয়ী, পরাগনুভবে তিনিই অন্বয়ী। ছাড়তে-ছাড়তে মনের উজান বেয়ে চলি—বলি তিনি এ নন, তা নন, কিছুই নন। আবার ভাটিয়ে আসবার সময় দেখি, সেই তিনিই এই-সব হয়েছেন। তখন বলি,

> তদ্ এজতি তন্ নৈ.জতি, তদ্ দূরে তদ্ ব.ন্তিকে।
> তদ্ অন্তর্ অস্য সর্বস্য, তদ্ উ সর্বস্যা.স্য বাহ্যতঃ ॥৫

—সেই তিনি কাঁপছেন, সেই তিনি কাঁপছেন না। সেই তিনি দূরে, আবার সেই তিনি কাছেই। সেই তিনি এই-সবের অন্তরে, আবার সেই তিনি এই-সবের বাইরে।

সবখোয়ানোর কূলে দাঁড়িয়ে যাঁকে দেখে এলাম, ফিরে এসে সেই অপরূপকে দেখছি যে এইখানেও। চোখ বুজে নয়, চোখ মেলেই দেখছি প্রাণের হিল্লোলে তিনি টলমল করছেন—এখানে ওখানে সবখানেই : তদ্ এজতি—'যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'।[১] এ-হিল্লোল বাইরে—আগুনের শিখায় জলের ধারায় ওষধি-বনস্পতির পাতার দোলায়—বিশ্বভুবন জুড়ে।[২] আবার এ-হিল্লোল অন্তরে, যেখানে তিনি সর্বময়---আমার চক্ষুতে শ্রোতে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে, আমার কামে অকামে ক্রোধে অক্রোধে ধর্মে অধর্মে সর্বময়।[৩] আবার উর্ধ্বে চেয়ে দেখি, সবছাওয়া অপ্রবর্তী আকাশের নিস্তল পূর্ণতা---এও তিনি : আর তন্

নৈ. ভাতি। সেই আকাশের ছায়া পড়ে অন্তরে, 'অন্তর্হৃদয়ে'।[৪] প্রপঞ্চোপশমের শান্তিতে সব নিথর হয়ে যায়; সেখানেও 'তন্ নৈ. ভাতি।

আবার সেই সমুদ্রবৎ আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠার গভীরে জাগে আদিত্যহৃদয়ের ক্ষোভ। দেখি, সেই অনির্বচনীয়ের অনিরুদ্ধ প্রাণের বিচ্ছুরণ বৈশ্বাস্তিক নীহারিকারও ওপারে উধাও হয়ে চলেছে : তদ্ দূরে—কোথায় কেউ বলতে পারে না : 'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্।' আবার সেই মুহূর্তেই লোকোত্তরের নিঃসীম হতে বিদ্যুন্নিমেষে যিনি গুটিয়ে আসেন নিঃসান্দ্র আত্মপ্রত্যয়ের নিস্তলে : তদ্ উ অন্তিকে—এই যে কাছের থেকেও আরও কাছে, সুখ-দুঃখ আলো-ছায়ার রসসংবিত্তিতে জীবনরসিক মধ্বদ আত্মারূপে[৫], যাঁকে 'অন্তি সন্তং ন জহাতি, অন্তি সন্তং ন পশ্যতি'—এত কাছে আছেন বলেই কেউ ছেড়ে যেতে পারে না, অথচ কাছে আছেন বলেই দেখতেও পায় না।[৬]

আত্মানুভবের এই সান্দ্রতা বিশ্বানুভবকেও চিন্ময় সান্দ্রতায় করে অনুবিদ্ধ। তখন সেই অনির্বচনীয়কে অনুভব করি সবার অন্তর্যামিরূপে : প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে যেমন আমার অন্তরে, পরাক্‌দৃষ্টিতে তেমনি সবার অন্তরে—**অন্তর্ অস্য সর্বস্য**। বিশ্বের রূপে-রূপে তিনি প্রতিরূপ,[৭] আবার বিদ্যুৎতন্তুর মত দীপাধারকে উদ্‌ভাসিত করে তার বাইরেও প্রচ্ছুরিত—**সর্বস্য অস্য বাহ্যতঃ** তখন দেখি, তিনিই সব—'পুরুষ এবে দং সর্বম্'[৮], তিনিই সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ হয়ে ভূমিকে সবদিক থেকে আবৃত করে ছাপিয়ে আছেন দশ আঙুল।[৯] বিশ্বের সব শীর্ষ তাঁর শীর্ষ, সব চোখ তাঁর চোখ, সব চরণ তাঁরই চরণ। তিনি বিশ্বান্তর্যামী বিশ্বরূপ, আবার বিশ্বের 'অতিষ্ঠাঃ'—'অনেজদ্ একং তৎ'।

এই অনুভবের সান্দ্রতায় বিবিক্ত অহংবোধ রূপান্তরিত হয়

পরিব্যাপ্ত আত্মবোধে—যে-আত্মা সর্বাধার সর্বান্তর্যামী এবং সর্বস্বরূপ।

যস্ তু সর্বাণি ভূতান্য্ আত্মন্য্ এবা.নুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চা.ত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

—যিনি কিন্তু সর্বভূতকে আত্মাতেই অনুদর্শন করেন এবং সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে, তার ফলে তিনি কোথাও জুগুপ্সা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্য্ আত্মৈ.বা.ভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ ॥ ৭

—যাঁর মধ্যে সর্বভূত আত্মাই হয়ে গেল বিজ্ঞানীর, তার মধ্যে কি-বা মোহ কি-বা শোক—একত্বের অনুদর্শন করছেন যখন।

ঈশানুভবের কথা হয়েছে, এইবার দুটি মন্ত্রে আত্মানুভবের কথা। দুটিতে একই অনুভবের এপিঠ-ওপিঠ। অনুভবের বিষয় যদি আমার বাইরে পড়ে থাকে—যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বেলায়—তাহলে সে-জ্ঞান বস্তুত পরোক্ষ। আর বিষয়কে আমি যদি 'হয়ে' জানি, তাহলে তার জ্ঞান অপরোক্ষ। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, আমরা আত্মাকে চাই বলেই সব-কিছু আমাদের প্রিয় হয়,[১] অর্থাৎ বিষয়প্রীতি মূলত আত্মপ্রীতি। এই সূত্র ধরে এমনও বলা যেতে পারে, বিষয়ানুভব মূলত আত্মানুভব, আর এ-অনুভব গাঢ় হয়, যেখানে প্রীতি থাকে। আমরা যাকে ভালবাসি, তার সঙ্গে সহজেই এক হয়ে যেতে পারি, আর তখনই তার সম্পর্কে যে-জ্ঞান তা অপরোক্ষ। ঈশ্বরসম্পর্কে জ্ঞানও এমনিতর অপরোক্ষ হলে তবে তাঁকে দিয়ে আমাদের জগৎকে

এবং জীবনকে আমরা উদ্ভাসিত করতে পারি। আর তখনই ঈশানুভব আর আত্মানুভব এক—তাঁকে জানাই মানে আমাকে জানা।

দেখেছি, ঈশকে জানতে হবে যুগপৎ অন্তর্যামী এবং অক্ষর—এই দুইরূপে। যেমন তিনি আমাদের জগৎ ও জীবনের প্রতিষ্ঠা, তেমনি তাদের অতিষ্ঠাও। এই হল শ্রুতির অনুশাসন। আবার এও দেখেছি, অতিস্থিতির সঙ্কর্ষণে চেতনার কোনও ভূমিতেই নিজেকে হারিয়ে আত্মহা হলে চলবে না, ঈশ্বরের অস্মিতার দ্বারা অনুবিদ্ধ আমার অস্মিতাকে রূপান্তরিত করতে হবে এক প্রজ্জ্বল আত্মবোধে। তখন তাঁর আমিই আমার আমি। আর তাঁকে আমি বা 'অহং' বলব না, বলব 'আত্মা'। 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ।'[২]

এমনি করে ব্যক্তিতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে পাই এক পরম-তত্ত্বেরই ত্রিপুটী—আত্মা, ঈশ এবং অনেজৎ বা অক্ষররূপে। আত্মাতে ঈশ এবং অক্ষরের অনুভবেই সমস্ত অনুভবের বিশ্রান্তি। আর এই অনুভব যদি কেবল অব্যবহার্য প্রপঞ্চোপশমে স্ফুরিত না হয়ে প্রপঞ্চোল্লাসে এবং ব্যবহারেও স্ফুরিত হয়, তাহলেই অনুভবের নিটোল পূর্ণতা। আলোচ্যমান মন্ত্র দুটিতে এই অখণ্ড আত্মানুভবের বিবৃতি।

গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে এ-অনুভবের তিনটি পর্যায়। প্রথমে অধিষ্ঠানরূপে আত্মার জ্ঞান, তারপর অন্তর্যামিরূপে তাঁর বিজ্ঞান এবং সবার শেষে সর্বাত্মভাব। বলা বাহুল্য, এখানে ক্রমের কল্পনা শুধু বোঝাবার সুবিধার জন্য। বস্তুত তিনটি অনুভব ওতপ্রোত এবং অখণ্ড।

অনুভবের একটি প্রকার: সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি। এটি একটি সহজ অনুভব। আবৃত্তচক্ষু হয়ে নয়,

এই চোখ মেলেই জ্ঞানীর সবাইকে দেখা। যেমন ব্যবহারিক জগতে সাধারণ মানুষ এক আলোর সমুদ্রে সবাইকে দেখে, তেমনি করে দেখা চৈতন্যের সমুদ্রে। সূর্যের আলো আর জড় আলো নয়, চিন্ময় আলো। সূর্য 'জীর অসুঃ'—দিকে-দিকে পরিস্পন্দিত প্রাণ, 'আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ'—যা-কিছু জঙ্গম, যা-কিছু স্থাবর তার আত্মা।[৩] এই দেবতাকে এই আত্মাকে এই চিন্ময় প্রাণকে দেখা দিনের পর দিন। তাইতে অন্তরে যেমন আদিত্যবর্ণ পুরুষের অনুস্মরণ,[৪] তেমনি বাইরে এই চোখ দিয়েই তাঁর 'অনুদর্শন'। অনুদর্শনে আত্মচৈতন্য উদ্দীপ্ত হয়, অধিদৈবত অনুভব আর অধ্যাত্ম অনুভব এক হয়ে যায়। তখন দেবতাই আত্মা, আত্মাই দেবতা। আর সেই নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মচৈতন্যের সমুদ্রে সর্বভূতের বীচিভঙ্গ।

তবুও এ-অনুভব যেন তটস্থ পুরুষের অনুভব। তিনি সব-কিছুকে জানছেন দেখছেন, কিন্তু কাউকে গ্রহণও করছেন না, বর্জনও নয়। অনুভবের পূর্ণতায় এখানে ব্যাপ্তির প্রশান্তি আছে, কিন্তু অনুবেধের তীক্ষ্ণতা নাই যেন। গীতার ভাষায় তিনি যেন জগৎ ও জীবনের উপদ্রষ্টা, বড় জোর অনুমন্তা।[৫] অপ্রবর্তী আকাশ বুক পেতে দিয়েই আছে; যা ঘটবার তা ঘটছে, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

অনুদর্শনের ফলে আত্মানুভব যখন আরও গাঢ় হল, তখনকার যে-দেখা তা সর্বভূতেষু আত্মানম্—সর্বভূতের গভীরে আত্মাকে দেখা। অধিষ্ঠানের প্রত্যয় তখন ঘনীভূত হল অন্তর্যামিত্বের প্রত্যয়ে। চৈতন্যের সমুদ্রে যারা ভাসছে ডুবছে, তারা অনাত্মীয় কিছুই নয়, তারা সেই চৈতন্যেরই পরিণাম। তৈজস একটি শক্তি সব-কিছুকে যে কেবল আলোক হয়ে উদ্ভাসিত করছে তা নয়, তাপ হয়ে সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থেকে বিকীর্ণও হচ্ছে। অধিষ্ঠান আকাশ; আর অন্তর্যামী সে-আকাশেই প্রাণে স্পন্দিত। আকাশ আর

প্রাণ—এ-দুটিকে পৃথক করা যায় না। আকাশ উপশম, আর প্রাণ উল্লাস। উপশমেরই উল্লাস, আবার উল্লাসেরই উপশম।

এ-অনুদর্শন শুধু তটস্থ থেকে নয়, সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে। দৃষ্টির সঙ্গে তখন যুক্ত হয় আনন্দ এবং শক্তি। যিনি উপদ্রষ্টা এবং অনুমন্তা ছিলেন, তিনি এখন ভর্তা ভোক্তা এবং মহেশ্বরও। অথচ তখনও দ্রষ্টৃত্বের প্রশান্তি তাঁর মধ্যে অব্যাহতই থাকে। তাই ভোগ আর ঐশ্বর্য তাঁর অনুদর্শনের সংবাদীই—বিবাদী নয়।

আর তাইতে জ্ঞানের পূর্ণতা বিজ্ঞানে—যার উল্লেখ এর পরের মন্ত্রে আছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। দুধ দেখার নাম জ্ঞান, আর খেয়ে গায়ে জোর করার নাম বিজ্ঞান।' অধিষ্ঠানপ্রত্যয়ে জ্ঞান, আর অন্তর্যামিত্ব-প্রত্যয়ে বিজ্ঞান। দ্রষ্টৃত্ব সমর্থ হয় অনুপ্রবেশে। দুটি মিলিয়ে আত্মানুভবের পূর্ণতা।

আর তারই ফলশ্রুতি হল—ততো ন বিজুগুপ্সতে। জুগুপ্সা চেতনার সঙ্কোচ, প্রতিকূলতার একটুখানি আভাসেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসা—শামুকের মত। এই হল অহন্তার ধর্ম—নিজের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা, সবাইকে অনাত্মীয় বলে দূরে ঠেকিয়ে রাখা। আত্মভাব তার বিপরীত—সে হল আলোর মত সবার উপরে ছড়িয়ে পড়া, কোথাও পরাঙ্মুখ না হয়ে অবিচারে সব-কিছুকে প্রকাশিত করা, বাইরের কোনও মালিন্যের লাঞ্ছনই গায়ে না মাখা।[৬] শুধু তা-ই নয়, সমমর্মিতার গভীরতায় রঞ্জনরশ্মির মত সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া, সবার সুখ-দুঃখ প্রিয়াপ্রিয়কে আপন করে নিয়েও আত্মবীর্যে সে-সবার ঊর্ধ্বে থাকা। এই হল সর্বব্যাপী এবং সর্বাবগাহী আত্মানুভব—যা সর্বতোভাবে অজুগুপ্স, বৃহদারণ্যকের ভাষায় সর্বানুভূ হয়েও অসঙ্গ।[৭]

এই হচ্ছে বিজ্ঞান, যার অন্তরতম অনুভব হল আত্মানুভবের

শেষ পর্যায়ে সর্বাত্মভাব। সর্বাবগাহী আত্মানুভবের দ্বারা আবিষ্ট থাকতে-থাকতেই (যস্মিন্‌) বিজানতঃ সর্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ—দেখা গেল, সর্বভূত বিজ্ঞানীর আত্মাই হয়ে গেছে। অনুদর্শনের এই চরম কোটি, যার মধ্যে সর্বভূত এবং আত্মার, দৃশ্য আর দৃকের, বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ অনিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায় এবং হয় সুপ্তি-সমাধিতেই নয়—জাগ্রৎ-সমাধিতেও। এই হল পরম অদ্বৈত—চেতনার সমস্ত ভূমিতে ঈশ আত্মা এবং জগতের অনবচ্ছেদে একত্বম্‌।

অধিষ্ঠান, অন্তর্যামিত্ব এবং এই ঐতদাত্ম্য[৮] বা সর্বাত্মভাব—তিনের অনুভবই অদ্বৈত এবং তিনটিতে একটি ত্রিপুটী। আগেই বলেছি, ক্রমের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবুও এদের মধ্যে গাঢ়তার একটা তারতম্য আছে, যা আলোরই মত পরস্পরের ব্যাবর্তক না হয়ে অনুবর্তক। তারতম্যের দরুন, প্রত্যগনুভবে নয়—বুদ্ধিতে যে-ভেদ আভাসিত হয়, তাকে ধরে তিনটি অনুভবের স্বরূপ বোঝা বোধ হয় সহজ হবে।

ঈশের মধ্যে এই জগৎ, তিনি সবার মধ্যে আছেন, তিনিই সব হয়েছেন—সরল বিশ্বাসে একথাগুলি মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না; কারণ এ-সমস্তই হল পরাক্‌-বৃত্ত অনুভবের কথা। ঈশ যতক্ষণ আমার অনুভবের বাইরে, ততক্ষণ তাঁকে বা জড়কে বিশ্বমূল ভাবার মধ্যে বস্তুত কোনও তফাত নাই। ঈশের অনুভব এবং তাঁর স্বভাব ও স্বধর্মের জ্ঞান বাস্তব হতে পারে একমাত্র প্রত্যগনুভবে। তাঁকে যদি আপন করে জানি—জানি আমার ও জগতের অধিষ্ঠানরূপে, জীবনের অন্তর্যামিরূপে, আমার আত্মভূত বলে—তবেই তাঁকে তত্ত্বত জানা সম্ভব।

এই জ্ঞান আসতে পারে তাঁর আবেশ হতে। তখন পূর্বোক্ত সহজ বিশ্বাসের কথাগুলি কাজে লাগে। তিনি আছেন, আকাশ

বাতাস আলো হয়ে সব ছেয়ে আছেন, আছেন প্রাণ হয়ে চেতনা হয়ে, আছেন অন্তরে বাইরে সব-কিছুতে আবিষ্ট হয়ে, আবার সব-কিছু ছাপিয়ে—এই শ্রদ্ধায় এই ভাবনায় আমার আত্মবোধ উদ্দীপ্ত হয়। আচ্ছন্ন চেতনার উপর বাইরের জগতের আঘাতে-আঘাতে একদিন যেমন আমার মধ্যে অহংটি দানা বেঁধেছিল, তেমনি তার মধ্যে বারবার বৃহতের আবেশে প্রমুক্ত আত্মবোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—ক্ষুদ্র অহং বিস্ফারিত হয় বৃহৎ আত্মায়। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'অহং' কাঁচা আমি, আর 'আত্মা' পাকা আমি। এক অহং আরেক অহংকে ঠেকিয়ে রাখে, কিন্তু আত্মা সবাইকে আপন করে নেন। যেমন ঈশের মধ্যে সবাই আছে, তেমনি তারা আছে আত্মার মধ্যে, আমার মধ্যে—যে-আমি তাঁর অথবা তিনিই। ঈশে আর আত্মাতে এই যে তাদাত্ম্যের বোধ—এ তাঁর আবেশের প্রথম পরিণাম।

কিন্তু গোড়ায় এ-অনুভব প্রত্যক্-বৃত্ত। অর্থাৎ এ-অনুভবে আমি ডুবতে পারি; তখন থাকেন শুধু তিনি অথবা আত্মা, অথবা তিনি আর আমি—কিন্তু জগৎ থাকে না। ফিরে এলে পর জগৎ আবার ভেসে ওঠে, কিন্তু নিরোধের সংস্কার প্রবল হওয়াতে প্রত্যগনুভবের কাছে পরাগনুভব ফিকা হয়ে যায়। মনে হয়, ভিতরটাই সত্য, বাইরটা আবছা। জগৎ তখন থাকলেও আছে বিনাশের কূলে স্বপ্ন হয়ে, ছায়ার মায়া হয়ে। চোখে যেন আলোর অঞ্জন মেখে তটস্থ থেকে দেখছি তাকে।

কিন্তু অধিষ্ঠান তো নিঃসত্ত্ব নয়, নির্জীবও নয়। আকাশ আর প্রাণ, শক্তি আর চৈতন্য, পুরুষ আর প্রকৃতি অবিনাভূত। অসঙ্গ আত্মাও নিঃশক্তিক নন। উপশমে আর উল্লাসে শক্তির স্ফুরত্তার (dynamism) শুধু দিক্‌পরিবর্তন হয়। উপশমে শক্তি সুপ্ত থাকে মাত্র, কিন্তু লুপ্ত হয় না। আবার উপশমের ভূমিকাতে

শুদ্ধসত্ত্বের স্ফুরণ স্বাভাবিক। এই শুদ্ধসত্ত্ব অসঙ্গ আত্মার যোগিনী প্রকৃতি।' পুরুষের অসঙ্গত্ব তখন প্রতিফলিত হয় ঊর্ধ্বপরিণামিনী প্রকৃতির পারার্থ্যে।

প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণাম যদি আমার জীবনের সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা জগতেরও সত্য। এই ঊর্ধ্বপরিণামের প্রবেগকে একদিন আমার মধ্যে অনুভব করেছি হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে সত্যের তীব্র দিদৃক্ষায়। এই দিদৃক্ষা তাহলে রয়েছে জগতেরও মূলে। তার তর্পণই মহাপ্রকৃতির বা জগতীর পারার্থ্যের কল্যাণতম রূপ। আর তা-ই ঈশেরও প্রশাসন আর অন্তর্যামিত্বের স্বরূপসত্য। এই অর্থে, যা আমার মধ্যে ঘটেছে, তা ভূতে-ভূতে ঘটেছে ঘটছে এবং ঘটবে। আমি এই ঘটনার তখন শুধু তটস্থ দ্রষ্টা নই, যিনি ঘটাচ্ছেন তাঁর দিব্যকর্মের শরীক। তখন আমার আত্মাকেই অনুভব করি সর্বভূতের অন্তর্যামী আত্মারূপে। আত্মা তখন শুধু উপদ্রষ্টা এবং অনুমন্তাই নন, তিনি ভর্তাও। আত্মানুভবের এই দ্বিতীয় পর্যায় এবং তা অধিষ্ঠানের অনুভবেরই গাঢ়তর রূপ।

এই থেকে আত্মানুভবের তৃতীয় পর্যায় বা ঐতদাত্ম্য মাত্র আরেক ধাপ। দেখছি, অনুভবের গাঢ়তায় আত্মায় আর সর্বভূতে যে-বিবেক, তা ক্রমেই ফিকা হয়ে পর্যবসিত হচ্ছে চিন্ময় অবিবেকে। প্রথম অনুভবে আত্মা আর সর্বভূত যেন অস্তিত্বের দুটি মেরু—যদিও আত্মা সর্বভূতের অধিষ্ঠান। সর্বভূত বা জগৎ তখন দৃশ্য, কিন্তু চিন্ময় দৃশ্য নয়। দ্বিতীয় অনুভবে জগতের চিন্ময় রূপান্তর সম্ভাবিত, দেখছি সর্বভূত আত্মা হয়ে উঠছে। এখানে শক্তির কালিক পরিণামের একটা অপেক্ষা আছে। আমাতে যা হয়ে আছে, সর্বত্র তা হচ্ছে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের চরম ঘনিষ্ঠতায় কালিক পরিণামের এই অপেক্ষাটুকুও আর থাকে না। তখন আমাতে যা হয়ে আছে, জগতের হওয়া তাতে

নিমজ্জিত, আমার মধ্যে জগৎও হয়েই আছে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রবচন স্মরণীয় : 'ময়ৈ.বৈ.তে নিহতাঃ পূর্ব ম্ এব'—অতএব যা.কিছু ঘটছে তা আমাতে ঘটেই আছে এবং ঘটছেও। ঘটনা ঘটিতেরই উন্মীলন মাত্র। অথবা এই উপনিষদেরই ভাষায়, ক্রতুর কৃতি বস্তুত কৃতের স্মরণ শুধু।

এই অনুভব কালাতীত। সেখানে আত্মা এবং সর্বভূতের ভেদ লুপ্ত—কালের উজানধারায়। কিন্তু এই অভেদের অনুভবকে ভাটার ধারায় ভেদের অনুভবে সঞ্চারিত করা আত্মানুভবের পরাকাষ্ঠা। আত্মা এবং সর্বভূত তখন এক—শুধু বিনাশে নয় সম্ভূতিতেও, প্রলয়ে নয় বিসৃষ্টিতেও, সমাধিতে নয় ব্যুত্থানেও। আত্মা তখন গীতার ভাষায় পরমাত্মা, পরমপুরুষরূপে এই দেহেই 'উপদ্রষ্টা.নুমন্তা চ—ভর্তা—ভোক্তা মহেশ্বরঃ'।

এই পরম আত্মানুভবের ফলশ্রুতি : তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ। যেখানে অনুলোম ও বিলোমক্রমে অক্ষর ঈশ জগতী আর জগৎ এক হয়ে গেল, সমস্ত খণ্ডতা নিটোল হয়ে গেল অখণ্ডের জ্বলন্ত এবং জীবন্ত প্রত্যয়ে, সমস্ত ভেদ স্বগত বলে অভেদের একরসপ্রত্যয়ের দ্বারা যেখানে জারিত—সেখানে শোক নাই, মোহ নাই। শোক আর মোহ অপ্রবুদ্ধ প্রাকৃত চিত্তের মৌল বৃত্তি। শোক চিত্তের জ্বালা, বিষয়ের অপ্রাপ্তিজনিত অতৃপ্তির দাহ। বিষয়কে অন্তরে না পেয়ে বাইরে খুঁজতে গেলেই তার প্রাপ্তি হয় অনিশ্চিত, নয়তো অপূর্ণ। কামহত চিত্তের জ্বালা তখন অবশ্যম্ভাবী—অপ্রবুদ্ধ জিজীবিষার যা অপরিহার্য অঙ্গ। শোকের মূলে যে-অপ্রতিবোধ—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'অচিত্তি'—তা-ই মোহ। যেখানে অর্থের সম্যক্ দর্শন এবং প্রত্যক্ অনুভবে তার সম্যক্ প্রাপ্তি, সেখানে মোহও নাই শোকও নাই।[৯] তখন

'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ', আর সে-অনুভব ব্যাবহারিক দশাতেও পূর্ণ প্রশান্ত এবং সম্প্রসন্ন।

এই অনুভবকে উপনিষদে প্রায়ই বৃহত্তর আবেশের ফলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ যেন দ্যুলোক হতে আলোর ঢল নামায় আধারের আলোময় হয়ে ওঠা। শ্রদ্ধা তখন উপাসনার মুখ্য অঙ্গ। পাশাপাশি সাধনার আরেকটি ধারা হচ্ছে—এখান থেকে ওখানে উজিয়ে যাওয়া। তখন তপঃ বা বীর্য হল মুখ্য সাধনাঙ্গ। পথের বাধা তখন আপনাহতে ক্ষয় হয় না, আত্মবীর্যে তাকে জয় করতে হয়। এই উপনিষদে আমরা চারটি বাধার উল্লেখ পেলাম—মোহ গৃধ্নুতা শোক ও কর্মলেপ। এরা যথাক্রমে দিব্যজ্ঞান দিব্যভোগ ও দিব্যকর্মের বাধক। সংহিতায় এদের সাধারণ সংজ্ঞা 'অংহঃ', বা চেতনার ক্লিষ্টতা ও সঙ্কোচ। ঈশের আবেশে চেতনা অনঘ ও বৃহৎ হয়, জিজীবিষা সার্থক হয়।

পরের মন্ত্রটিতে আমাদের জিজীবিষার সঙ্গে মিলিয়ে ঈশের ক্ষর এবং অক্ষর স্বভাবের অবিভক্ত বিবৃতি।

> **স পর্যগাচ্—ছুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্**
> **অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।**
> **কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্**
> **য়াথাতথ্যতো ঽর্থান্ ব্যদধাচ্ ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮**

—তিনি চারদিকে ছড়িয়ে গেলেন—(যিনি তৎস্বরূপ), শুক্র, অকায়, অব্রণ, অস্নায়ু, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। (তিনি) কবি, মনীষী, পরিভূ এবং স্বয়ম্ভু হয়ে যথাযথ অর্থসমূহের বিধান করলেন শাশ্বত কাল ধরে।

মন্ত্রটিতে পরমতত্ত্বকে পর্যায়ক্রমে পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দে লক্ষিত করা হয়েছে। গোড়াতেই পাচ্ছি পুংলিঙ্গ 'সঃ'—বোঝাচ্ছে

ঈশকে। তিনি পুরুষবিধ—তাঁর গুণ আছে, কর্ম আছে। তাঁর পরেই কয়েকটি ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ, বোঝাচ্ছে উহ্য 'একং তৎ'-কে। বিশেষণগুলির অধিকাংশই নেতিবাচক, বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের 'নেতি নেতি' আদেশের মত।[1] তারপর আবার কতকগুলি পুংলিঙ্গ বিশেষণ। সমস্ত মিলিয়ে সজীব ভাষায় ঋক্‌সংহিতার সেই অক্ষরের ক্ষরণের বিবৃতি—যা বিশ্বের উপজীব্য।[2]

মন্ত্রের প্রথমেই ছোট্ট একটি বাক্য: স পর্য্যগাৎ—তিনি ছড়িয়ে পড়লেন। এ যেন চোখের সামনে রঙ্গমঞ্চের পট ওঠার মত—অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় কুৎস আঙ্গিরসের দুটি মন্ত্রে আঁকা সূর্যোদয়ের বর্ণাঢ্য চিত্র:[3]

উদ্ ঈর্ধ্বং জীর অসুর্ ন আ. গাদ্
অপ প্রা.গাৎ তম আ জ্যোতির্ এতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্যায়া.
গন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥

—তোমরা উদ্যত কর নিজেদের। তিনি আমাদের জীবন, যিনি আমাদের প্রাণ, ওই যে তিনি এলেন। দূরে চলে গেল অন্ধকার, ওই যে আলো আসছে। ছেড়ে দিল উষা সূর্যের যাত্রাপথ, আমরা গেলাম সেখানে যেখানে সবার আয়ুর প্রতরণ।

চিত্রং দেবানাম্ উদ্ অগাদ্ অনীকং
চক্ষুর্ মিত্রস্য বরুণস্যা.গ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ॥

—চেয়ে দেখ, উঠে এল দেবতাদের অপরূপ পুঞ্জজ্যোতি, চক্ষু যা মিত্রের বরুণের আর অগ্নির। আলোয় ভরলেন দ্যুলোক পৃথিবী আর অন্তরিক্ষ এই সূর্য—আত্মা যিনি জঙ্গম আর স্থাবরের।

'স পর্যগাৎ'—এই যে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন, যিনি ওই আদিত্যমণ্ডল, অথবা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী সেই পুরুষ যাঁর সঙ্গে আমি এক।[৪] তাঁর রশ্মির ব্যূহনে প্রাণস্পন্দিত হয়ে উঠল স্থাবর-জঙ্গম, অনন্তের রহস্য যেন চোখ রাখল আমার চোখের 'পরে।

কিন্তু আদিত্যের শুক্লভাতির পিছনেই রয়েছে আকাশের পরঃকৃষ্ণ নীলিমা, বচনীয়ের অনুভবকে আবৃত করে রয়েছে অবাঙ্‌মানস-গোচরের স্তব্ধতা। ঈশ সেখানে অসংকল্প সন্মাত্র। তিনি শুক্রম্‌—এক বিশোক নির্মোহ সত্তার শুক্লতা। একই শুচ্‌ ধাতু হতে 'শোকঃ' আর 'শুক্রম্‌'। শোক ধূমায়িত অগ্নির জ্বালা, আর অধূমক জ্যোতি শুক্র। প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্যদ্যুতি তৎস্বরূপেরই 'শুক্লং ভাঃ'—যা নির্বিশেষ সত্তার শুভ্রতা মাত্র। আবার ঋক্‌সংহিতায় দেখি, অবর্ণ আকাশই 'শুচি', আর তাতে অবস্থিত আদিত্যমণ্ডল 'হংসঃ শুচিষৎ'।[৫] একই শুচ্‌ ধাতু হতে শোক শুক্র এবং শুচি চিত্তের ধূমায়িত অধূমক এবং অবর্ণ স্থিতির জ্ঞাপক।

'শুক্রম্‌' আদিত্যের 'শুক্লং ভাঃ',[৬] রূপ আর অরূপ দুদিকেই তার ইশারা। এখানে ভাঃ অকায়ম্‌—তার কায় নাই। 'কায়' এসেছে চি ধাতু হতে, যার অর্থ 'সংহত করা'। শক্তি ও জ্যোতির সংহননে ঈশের কায়—যেমন এই উপনিষদেই সূর্যের তেজের সমূহনে, আবার তারও গভীরে তাঁর কল্যাণতম পৌরুষ রূপে।[৭] অধি-দৈবতদৃষ্টিতে, সূর্যে তিনি চিদ্‌ঘন; আর তদন্তর্বর্তী 'হিরণ্যশ্মশ্রুর্‌ হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎসর্ব এব সুবর্ণঃ' হিরণ্ময়পুরুষে[৮] চিদ্‌ঘনবিগ্রহ। এখানে 'শুক্লং ভাঃ'র ইশারা অবিগ্রহ অরূপের দিকে। সে কোথাও সংহত হচ্ছে না, আকাশানন্ত্যের বারুণী শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে—যেখানে কঠোপনিষদের ভাষায় 'ন সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকম্‌'[৯], বৃহদারণ্যকের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা.স্তি'।[১০] প্রত্যগনুভবে এ হল পূর্ণের অন্তরে শূন্যকে দেখা—যা বৌদ্ধের

ভাষায় নিজের মধ্যে পুদ্গলনৈরাত্ম্যের শূন্যতা, আর সবার মধ্যে ধর্মনৈরাত্ম্যের শূন্যতা। ব্যবহারিক ভূমিতে তা সর্বত্র সমদর্শনের প্রশান্তি।

পূর্ণতার গভীরে এই-যে শূন্যতার অনুভব, হিরণ্ময়পুরুষের হৃদয়ের অন্তস্তলে এই-যে সত্য-ধর্মের নীল বিদ্যুন্নিমেষ,[১১] তাকে আরও দুটি বিশেষণে বিশেষিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই পরিব্যাপ্ত অকায় ভাঃ অব্রণম্ অস্নাবিরম্—তার ব্রণ নাই, স্নায়ু নাই। ব্রণ হল সেই ক্ষত বা ছেদ, শুকিয়ে গিয়ে পূরে আসলেও যার দাগ থাকে। এ হল ভেদাভাসের প্রতীক। চিদ্ঘনবিগ্রহের সান্দ্রতায় স্বগতভেদের যে-লীলায়ন, তা অভেদের দ্বারা জারিত ভেদের আভাস মাত্র। কিন্তু অবিগ্রহের অবগাঢ় শূন্যতায় সে-আভাসও নাই। তাই তা অব্রণ, অনবচ্ছিন্ন নিবিড়তায় নিটোল—যেমন প্রত্যগাত্মার সুপ্ত-জাগ্রত নির্বিশেষাদ্বৈত অনুভবে। আবার স্নায়ু বলতে বোঝায় পেশীবন্ধনী, যা বিশ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করে। বৃহদারণ্যকে 'সর্বেশ্বর ভূতাধিপতি মহান্ আত্মা'কে বলা হয়েছে, 'এষ সেতুর্ বিধরণ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়।'[১২] স্নায়ুও এমনিতর বিধৃতির সাধন। কায় একটি সপ্রাণ সংঘাত (organic system)। তাই তার পেশী আর স্নায়ুর মধ্যে স্বগতভেদ। পুরুষ এক হয়েও 'রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব।'[১৩] তখন কায়দৃষ্টিতে বহুর সঙ্গে একের সম্বন্ধ বোঝাতে স্নায়ু বা সেতুর উপমা দেওয়া চলে। কিন্তু একক অখণ্ড শুক্লভাতির বহু রশ্মিতে বা আলোকবিন্দুতে বিচ্ছুরণের বেলায় স্নায়ু বা সেতুর উপমা নিষ্প্রয়োজন এবং অসিদ্ধ। 'একং তৎ' তা-ই 'বহুনা লোকানাং বিধরণঃ' হয়েও অস্নাবির।

তারপর তৎস্বরূপের আর দুটি বিশেষণ শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। একটি লক্ষণ ইতিবাচক, আরেকটি নেতিবাচক। দুয়ের মূলে একই ভাব।

যা অসঙ্গ, যা বৃহৎ, সংহিতার ভাষায় যা 'স্বধাবঃ' অর্থাৎ আপনাতে আপনি আছে, তা-ই শুদ্ধ—যেমন আকাশ, যেমন আলো। অবিশুদ্ধি আসে অনাত্মবস্তুর সংস্পর্শ হতে। যেখানে আত্মায়-অনাত্মায় ভেদ নাই, আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে এবং আবেশে যেখানে সবই আত্মীয়, সেখানে অবিশুদ্ধ বলে কিছুই নাই।

শুদ্ধত্বের এ হল স্বরূপলক্ষণ, যার অনুভব যোগারূঢ়ের সর্বাত্মভাবেই সম্ভব। কিন্তু আরুরুক্ষু চেতনায় এবং ব্যাবহারিক জগতে শুদ্ধি এবং অবিশুদ্ধি দুয়ের দ্বন্দ্ব আছেই। জিজ্ঞাসুর মনে স্বভাবত তখন প্রশ্ন জাগে, জগতে অবিশুদ্ধি কেন, অখণ্ড সত্তার মধ্যে কোথায় তার স্থান। অবিশুদ্ধিকে যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে এ-প্রশ্ন দর্শনের সেই বিখ্যাত Problem of Evil নিয়ে, উপনিষদে যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে একটু ভিন্ন রীতিতে।

অবিশুদ্ধিকে এখানে বলা হয়েছে 'পাপ'। সংহিতায় পাপের এক সংজ্ঞা হচ্ছে 'অংহঃ' বা চেতনার সংকোচ। যা-কিছু এই সঙ্কোচের কারণ, তা-ই পাপ—তার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগ থাকুক বা না থাকুক। তাইতে শুধু অশুভ প্রবৃত্তিই নয়, যে-কোনও অশুভ শক্তিই পাপ।[১৪] পরাক্ দৃষ্টিতে সে 'রক্ষঃ' বা 'বৃত্র' অর্থাৎ দেববিরোধী এক আসুরী শক্তি।[১৫] কিন্তু এ-দুয়ের বিরোধ সৃষ্টির মূলে—দেবতা আর অসুর দুইই প্রাজাপত্য বা প্রজাপতির সন্তান।[১৬] কাজেই প্রজাপতিকে নিছক ভালমানুষ বানিয়ে তাঁর মধ্যে পাপ কোথা হতে এল, তা নিয়ে মাথা ঘামানো সম্যক্ দৃষ্টির অভাব মাত্র সূচিত করে। সৌরকলঙ্কের মত অখণ্ডের মধ্যে পাপ আছেই, তাকে উড়িয়ে দেবার কোনও উপায় নাই। তার প্রয়োজনও নাই, কেননা পাপের সত্তা থাকলেও তার পরসত্তা নাই। দেবাসুরের সংগ্রামে শেষপর্যন্ত অসুরের পরাভব এবং দেবতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

জগৎ থেকে পাপকে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়, সুতরাং সেখানে তার মূল না খুঁজে খুঁজতে হবে আমার মধ্যে, কেননা শুদ্ধ বা অনঘ হওয়ার একটা তাগিদ আমার মধ্যে আছেই। ব্রাহ্মণ তাই বললেন, পাপের মূল হল আমার 'অশনায়া' বা বুভুক্ষা;[১৭] আর উপনিষদ বললেন, পাপের মূল দ্বৈতবোধে যা তত্ত্বত প্রাণের অবিশুদ্ধি।[১৮] বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই অন্যভাবে বলছেন : যাঁর এষণা নাই, তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে আত্মাতেই আত্মাকে দেখেন, আবার সবাইকে দেখেন আত্মারূপে। তিনি সমস্ত পাপের ওপারে।...এমন-কি, 'এই তো আমি পাপ করলাম' বা 'এই তো আমি পুণ্য করলাম' এ-দুটি ভাবনার তিনি ওপারে।[১৯]

যাঁর এষণা নাই, তিনি আত্মতৃপ্ত, তিনি আপনাতে আপনি আছেন। তাই তিনি স্বধাবান্, অতএব অসঙ্গ। তাঁর অনুভবের প্রত্যক্ বৃত্তি। তারই গাঢ়তায় অনুভবের পরাক্ বৃত্তি—আত্মকেন্দ্র হতে বিশ্বে বিচ্ছুরণ। তখন তিনি বৃহৎ, তিনি সর্বভূতাত্মভূতাত্মা। আগেরটিতে তিনি শুদ্ধ—তাঁর কৃতও নাই, অকৃতও নাই।[২০] কিন্তু পরেরটিতে তিনি স্বরূপত শুদ্ধ হলেও, যে-সর্বভূত তাঁর প্রতিরূপ তাদের মধ্যে পাপ-পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব আছে, তা তাঁকে স্পর্শ করছে না বা তাঁতে লগ্ন হচ্ছে না—যেমন আদিত্যের অবর্ণ শুক্র ভাঃ বিচিত্র বর্ণের নির্বাহক হয়েও তাদের দ্বারা লিপ্ত হয় না। এই নির্লেপ সর্বাত্মভাবের অপাপবিদ্ধত্ব। আত্মা প্রত্যগনুভবে শুদ্ধ, পরাগনুভবে অপাপবিদ্ধ। তৎস্বরূপ অতিষ্ঠারূপে শুদ্ধ, প্রতিষ্ঠারূপে অপাপবিদ্ধ।

পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বকে যাজ্ঞবল্ক্যের এষণাবাদ দিয়ে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পুত্রৈষণা মনুর ভাষায় 'প্রবৃত্তির্ এষা ভূতানাম্'[২১] —সুতরাং তা প্রাকৃতদৃষ্টিতে পাপও নয়, পুণ্যও নয়।

বিত্তৈষণা গৃধ্নুতায় পর্যবসিত হতে পারে, সুতরাং তাতে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত। লোকৈষণায় মানুষ দেবতা হতে চাইছে; পাপ হতে উত্তরণের প্রযত্নে তা পুণ্যময়। কিন্তু দেবত্বলাভই মানুষের পরম-পুরুষার্থ নয়—'নৈ.নদ্ দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ।' তাই তার প্রেপ্তি অদিতির সেই 'অনাগাস্ত্ব' বা নিরঞ্জনত্বের প্রতি,[২২] যা স্বধায় 'অতিষ্ঠা', স্বাহায় 'প্রতিষ্ঠা'। সেখানে পাপও নাই, পুণ্যও নাই, অথচ আছে সর্বানুভবের অতিমুক্তি।

'একং তৎ'এর ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণের বিবৃতি এইখানে শেষ হল। আমরা এতে তাঁর নির্বিশেষ স্বরূপের পরিচয় পেলাম। এর বোধ আমাদের চেতনার পটভূমিকারূপে থাকবে এবং তা-ই দিয়ে জগৎকে দেখতে হবে যেন শূন্যের বুকে পূর্ণের উচ্ছলন, যেন 'পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।' তার পরিচিতি মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধের পুংলিঙ্গ বিশেষণ-গুলিতে। এগুলি 'পুরুষ'সম্বন্ধে প্রযোজ্য, আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে যাঁর কল্যাণতম রূপ চিন্ময় প্রত্যক্ষের গোচর হতে পারে।

তাঁর প্রথম পরিচয়, তিনি **কবিঃ মনীষী**। কূ ধাতু হতে 'কবি'। তিনিই কবি, যাঁর মধ্যে 'আকূতি' আছে। আকূতি নিগূঢ় কামনা। ঋক্‌সংহিতায় কামনা সেই 'মনসো রেতঃ' বা মনের উচ্ছল প্রবেগ, যা সব-কিছুর আদিতে আছে।[২৩] মানুষের মধ্যে এ-কামনা হৃদয় দিয়ে মনীষা দিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে সৎএর বৃন্তটিকে পাওয়ার—অবশেষে কিন্তু অসৎএরই মধ্যে। মানুষ তাইতে কবি।[২৪] আবার পরমদেবতাও কবি। তাঁর আকূতি 'বিসৃষ্টি'র বা আত্মোৎ-সারণের—এক অক্ষীয়মান উৎস হতে শতধারায় নিজেকে বইয়ে দেবার।[২৫] তাঁর কাব্য এই জগৎ। শৌনকসংহিতার ঋষি তাই জগতের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি' —চেয়ে দেখ দেবতার কাব্য, এ মরল না জীর্ণও হয় না।[২৬] দুই কবিরই কাব্যের সাধন হল বাক্। বাক্ হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় আকূতির

ছন্দোরূপ, যার তিনটি পদ গুহায় নিহিত, শুধু একটির প্রকাশ এইখানে—যেমন মানুষ-কবির কৃতিতে, তেমনি পরমকবির বিসৃষ্টিতে।[২৭] দুইই ভাবের উচ্ছলন। ভাব লোকোত্তর, গীতার ভাষায় তা 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়'। কবিই তার দ্রষ্টা। তাই তিনি 'ক্রান্তদর্শী'—দেখেন সুদূরের ভাবকে, যা এখনও বস্তু হয়ে ফোটেনি। ঈশও ক্রান্তদর্শী কবি, এ-জগৎ তাঁর হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নের পসরা।

ঈশ যেমন কবি, তেমনি তিনি আবার মনীষীও। দুটি বিশেষণ অন্যোন্যসঙ্গত। ঋক্‌সংহিতায় পরমদেবতার উদ্দেশে ধ্যানচিত্তকে মার্জিত করবার কথা আছে 'হৃদা মনসা মনীষা'।[২৮] মন তাঁকে পাওয়ার প্রথম সাধন। মনের উজানে বিজ্ঞান, তা-ই সংহিতার মনীষা। তারও উজানে হৃদয়, যাতে সবার পরমা স্থিতি,[২৯] আত্মা যাতে রয়েছেন,[৩০] সংহিতার বর্ণনায় যা জ্যোতির সমুদ্র অর্থাৎ বোধিদীপ্ত চেতনার উল্লাস।[৩১] কবির কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে হৃদয়ের যোগ সুস্পষ্ট। বলা যেতে পারে, কবির হৃদয়ে যে-কাব্য আনন্দে সান্দ্র হয়ে আছে, বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিসত্ত্বে যখন তার সুবিন্যস্ত প্রকাশ ঘটে, কবি তখন মনীষী। আনন্দ থেকে মনীষায় নেমে এসে পরমকবির কাব্য বিসৃষ্টির ধারায় আরেক পর্ব এগিয়ে এল। এ যেন যুগনদ্ধ ব্রহ্ম-বাকের সামরস্যের[৩২] মধ্যে দেখা দিল এক অদ্বৈত ভাবনিবিড় বহুধা-সম্ভূতির প্রদ্যোত—নীল আকাশে সৌরবিম্বের মত। বিশ্বভুবনের ঈক্ষায় কবি ঈশ হলেন মনীষী।

তারপর আরেক ধাপ এগিয়ে এসে তিনি হলেন পরিভূঃ, অথচ স্বয়ম্ভু। যিনি 'পরিভূ', দিকে-দিকে তিনি 'হচ্ছেন'। এই হওয়া যেন নীরন্ধ্র ব্যাপ্তিতে আকাশ ছেয়ে উষার আলোর ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠা। মনীষী কবি এবার হলেন পরিভূ, তাঁর ক্রান্তদর্শন যেন ভাবরূপ থেকে নেমে এল ছন্দোরূপে। আগে পেয়েছি 'স পর্যগাৎ'; এখন পেলাম 'স পর্যভবৎ'। একটি গতি, আরেকটি ভূতি।

গতিতে আছে যেন রশ্মিজালের পরিকীর্ণতা, আর ভূতিতে আভার পরিব্যাপ্তি। 'তিনি হচ্ছেন' এ-অনুভব এক অন্তরাবৃত্ত নিবিড় অনুভব ; আর তিনি যে চলছেন, তার মধ্যে রয়েছে এক বহিরাবৃত্ত দৃষ্টির বিবিক্ততা (separativeness)। প্রত্যগ্‌দৃষ্টিতে তিনি হচ্ছেন, আর পরাগ্‌দৃষ্টিতে তিনি চলছেন। কিন্তু দুইই যুগপৎ, তিনি চলতে-চলতে হচ্ছেন।

আবার যখন তিনি পরিগন্তা (সংহিতার ভাষায় 'পরিজ্‌মা') এবং পরিভূ, তখনই তিনি স্বয়ম্ভূ। স্বয়ম্ভূ 'স্বধারঃ'—আপনাতে আপনি থেকে কোনও অনাত্মীয় নিমিত্তের অপেক্ষা না রেখেই তিনি হচ্ছেন, অথচ সে-হওয়া তাঁরই পরিভবনের নিমিত্ত। এ যেন বর্তুলের নির্ধ্রুব কেন্দ্র হতে পরিধির অভিমুখে পরিস্পন্দের সঞ্চারণ—সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে অসৎ হতে সৎ-এর জনন।[৩৩] স্বয়ম্ভূ 'তৎ সৎ', 'অনেজদ্‌ একং'-রূপে সব-কিছুর অধিষ্ঠান ; তারই মধ্যে আদিত্যহৃদয়ের ক্ষোভ হল পরিভবন।

এই উপনিষদেই আরও-দুটি সংজ্ঞা আছে—অসম্ভূতি এবং সম্ভূতি। অসম্ভূতি তাঁর অক্ষররূপে আপনাতে আপনি থাকা ; তা-ই তাঁর স্বয়ম্ভূ সদ্‌ভাব। তা থেকে পরিভূরূপে তাঁর উদ্ভাস এবং উচ্ছলন হল সম্ভূতি। এছাড়াও বেদে আরেকটি সংজ্ঞা আছে—'বিভূতি'। তখন তিনি বিচিত্ররূপে 'পর্যগাৎ'—এক থেকেই বহুতে পরিকীর্ণ।

প্রজ্ঞা আর প্রাণের সাযুজ্যের কথা আছে কৌষীতকি-উপনিষদে। বলা হয়েছে যা প্রজ্ঞা তা-ই প্রাণ, যা প্রাণ তা-ই প্রজ্ঞা।[৩৪] বলা যেতে পারে, প্রজ্ঞা স্বয়ম্ভূ, প্রাণ পরিভূ। দুয়ের অবিনাভাবকে শিব-শক্তির অবিনাভাবের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

ঈশ স্বয়ম্ভু—এই তাঁর সত্তার এক মেরু। আরেক মেরুতে তিনি

বিধাতা। তখন তাঁর এই পরিচয় : 'স যাথাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। এই হল অক্ষরের সার্থক ক্ষরণ, জগতীতে জগতের ঋতচ্ছন্দ লীলায়ন। ঈশ পরিভূ—তিনিই জগৎ হয়েছেন। সে-জগৎ চলছে, অর্থাৎ তিনিই চলছেন, তিনি 'পরিজ্‌মা'। দিকে-দিকে এই চলা এই পরিস্পন্দ যেন সমুদ্রের তরঙ্গদোলা—কি তার লক্ষ্য, আপাতদৃষ্টিতে কিছুই বোঝা যায় না। এ-গতি এলোমেলো, তার নিদান অব্যক্ত রাত্রির রহস্যে নিমজ্জিত।[৩৫] কিন্তু মাথার উপরে দেখছি চন্দ্র-সূর্যের গতি, তার ফলে অহোরাত্রের আর ঋতুচক্রের আবর্তন। সে-গতি আর এলোমেলো নয়, তা ছন্দোময় ঋতময়। তাকে আশ্রয় করে প্রাণ আর প্রজ্ঞার 'উন্মেষ'।[৩৬] প্রাণ আর প্রজ্ঞা ঋতময়—কেননা যেখানেই জিজীবিষা, সেখানেই নির্ঋতিকে (chaos, disorder) পরাভূত করে ঋতের আবির্ভাব। যদৃচ্ছার (-chance) এলোমেলো গতি সেখানে গুছিয়ে আসেই। তারপর প্রাণের ঋতকে আশ্রয় করে উত্তরোত্তর প্রজ্ঞার উন্মেষ। ঋক্‌সংহিতার ভাষায়, এ যেন তার শিখর হতে শিখরে আরোহণ করতে-করতে দেখতে পাওয়া কত তার করবার আছে আর সঙ্গে-সঙ্গে তার 'অর্থ' বা লক্ষ্যের চেতনা ফুটে ওঠা।[৩৭] এই লক্ষ্যাভিসারী গতির পর্বে-পর্বে বস্তু ও ঘটনার যে ঋতময় বিন্যাস, তাই বিধাতার যাথাতথ্যত বিধান—ঠিক যেখানে যেমন দরকার তেমনি করে সব কিছুকে গুছিয়ে দেওয়া। ঈশের প্রশাসনের এই তাৎপর্য। জগৎ জুড়ে বিশ্বচৈতন্যের আবেশে জগতীচ্ছন্দের এই দোলন। কিন্তু পরিভূরূপে তিনিই যখন সব হয়েছেন, তখন এ তাঁর আত্মবিকিরণেরই ছন্দ।

ঈশ আত্মা ও জগতের অন্যোন্যসম্বন্ধনিরূপণে উপনিষদের একটি পর্ব এইখানে শেষ হল।[৩৮] ঈশ যুগপৎ অক্ষর এবং অন্তর্যামী। কিন্তু তাঁর এ-দুটি বিভাবের উপর প্রাচীনকাল হতেই আলাদা-

আলাদা করে জোর দেওয়ার ফলে যে-সম্প্রদায়বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এরপর দুটি মন্ত্রগুচ্ছে তার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম গুচ্ছে দৃষ্টি অধ্যাত্ম, দ্বিতীয় গুচ্ছে অধিবিশ্ব।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যাম্ উপাসতে।
ততো ভূয় ইবতেতমো য় উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯
অন্যদ্ এবা.হুর্ বিদ্যয়া.ন্যদ্ আহুর্ অবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং য়ে.নস্ তদ্ বিচচক্ষিরে ॥ ১০
বিদ্যাং চা.বিদ্যাং চ য়স্ তদ্ বেদো.ভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া.মৃতম্ অশ্নুতে ॥ ১১

—অন্ধতমিস্রায় প্রবেশ করে তারা, যারা অবিদ্যার উপাসনা করে। যেন তার চাইতে বেশী (অন্ধকারে প্রবেশ করে), যারা নাকি বিদ্যায় রত।

এই (পাওয়া যায়) বলছেন (কেউ-কেউ), বিদ্যা দিয়ে। অন্য-কিছু (পাওয়া যায়) বলছেন (অন্যেরা), অবিদ্যা দিয়ে। এইরকমই শুনেছি আমরা ধীরদের কাছে, যাঁরা আমাদের কাছে 'তৎ'কে ব্যাখ্যা করেছেন।

বিদ্যাকে আর অবিদ্যাকে যিনি 'তৎ' বলে জেনেছেন দুটিকে মিলিয়ে নিয়ে, তিনি অবিদ্যা দিয়ে মৃত্যু পার হয়ে বিদ্যা দিয়ে অমৃতকে সম্ভোগ করেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি য়ে ঽসম্ভূতিম্ উপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য় উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২
অন্যদ্ এবা.হুঃ সম্ভবাদ্ অন্যদ্ আহুর্ অসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং য়ে নস্ তদ্ বিচচক্ষিরে ॥ ১৩
সম্ভূতিং চ বিনাশং চ য়স্ তদ্ বেদো.ভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যা. মৃতম্ অশ্নুতে ॥ ১৪

—অন্ধতমিস্রায় প্রবেশ করে তারা, যারা অসম্ভূতির উপাসনা করে। যেন তার চাইতে বেশী (অন্ধকারে প্রবেশ করে), যারা নাকি সম্ভূতিতে রত।

এই (পাওয়া যায়) বলছেন (কেউ-কেউ), সম্ভূতি হতে ; অন্য-কিছু (পাওয়া যায়) বলছেন (অন্যেরা), অসম্ভূতি হতে। এইরকমই শুনেছি আমরা ধীরদের কাছে, যাঁরা 'তৎ'কে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন।

সম্ভূতিতে আর বিনাশকে যিনি 'তৎ' বলে জেনেছেন দুটিকে মিলিয়ে নিয়ে, তিনি বিনাশ দিয়ে মৃত্যু পার হয়ে সম্ভূতি দিয়ে অমৃতকে সম্ভোগ করেন।[১]

প্রথম মন্ত্রগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই : অবিদ্যার উপাসনা আর বিদ্যার উপাসনার ফল আলাদা-আলাদা। কিন্তু সত্য বলতে দুয়েরই ফল অন্ধতা, যদি তাদের পৃথক্ করে ধরা হয়। চাই দুয়ের সহবেদন। তার ফলে অবিদ্যা হয় মৃত্যুতরণের আর বিদ্যা অমৃতসম্ভোগের উপায়।

কথাগুলি হেঁয়ালির মত ঠেকে। বিশেষত অবিদ্যার উপাসনায় কি করে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, তা বোঝা যায় না।

ব্যাখ্যাকারেরা সবাই অবিদ্যার প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেছেন। সাধারণত অবিদ্যা বলতে আমরা বুঝি তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, যার ফলে প্রাকৃত চেতনায় দেখা দেয় শোক এবং মোহ। এ যে কখনও মৃত্যুতরণের সাধন হতে পারে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অবিদ্যাকে এখানে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না।

বস্তুত অবিদ্যার একটি রাহস্যিক অর্থ আছে, যার উদ্দেশ আমরা সংহিতায় উপনিষদে এবং মরমীয়াদের বাণীতে পাই। প্রথমেই মনে পড়ে, কেনোপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি : 'অন্যই বটে তৎস্বরূপ— যা বিদিত তা হতে ; আবার যা অবিদিত তার উপরে তিনি। এমনই শুনেছি আমরা পূর্ব-(সূরিদের) কাছ থেকে যাঁরা আমাদের কাছে তৎস্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন।...যিনি আমাদের মধ্যে তৎস্বরূপকে জানেন, তিনি তাঁকে জানেন না ; যিনি জানেন না, তিনিই জানেন।'[২] তৎস্বরূপ 'অবিদিতাদ্ অধি'—এই এক অবিদ্যা, যাকে বলতে পারি লৌকিক বা প্রাকৃত। এই অবিদ্যার 'তমসঃ

পরস্তাৎ' তিনি আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ,[৩] যাঁর বিদ্যা অমৃতত্বের সোপান। কিন্তু আদিত্যের শুক্ল ভাতির বিদ্যাই পুরুষার্থের চরম নয়, তৎস্বরূপ 'অন্যদ্ এর রিদিতাৎ'—তাঁর বিদ্যার প্রকার যা-ই হক না কেন, তিনি তাহতে অন্য-কিছু। তাইতে যে বলে—তাঁকে জানি, সে কিছুই জানে না; যে বলে—তাঁকে জানি না, সে-ই জানে।[৪] তাঁকে না জানাই জানা—এই আরেকধরনের অবিদ্যা, যা অলৌকিক বা অপ্রাকৃত।

প্রাকৃত অবিদ্যা হতে বিদ্যার অভীপ্সা নিয়ে উপাসকের যাত্রা শুরু হয়। বেদের ভাষায় তিনি তখন 'নচিকেতা'।[৫] কিন্তু জানতে গিয়ে তিনি দেখেন, এত জেনেও তাঁর কিছুই বুঝি জানা গেল না। তাইতে যাত্রাশেষে তিনি এক অনির্বচনীয় অবিদ্যার সামনে এসে দাঁড়ান, যাতে আদিত্যের শুক্লভাতিকে ছাপিয়ে তাঁর পরঃকৃষ্ণ নীলিমার পরিচয়। সংহিতার ভাষায় তিনি তখন 'নবেদাঃ'—পরম ব্যোমে অনুভবের তুঙ্গতায় দাঁড়িয়েও তাঁর দৃষ্টি 'অপ্রকেত গহন গভীরের' রহস্যকে ভেদ করতে পারে না বলে বলা যায় না 'সো অঙ্গ রেদ য়দি রা ন রেদ।'[৬] বিদ্বানের বিদ্যাকেও ছাপিয়ে এই নবেদার অবিদ্যা। সংহিতায় 'নবেদাঃ' বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা।

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এই অবিদ্যার নাম দিয়েছেন 'অসংজ্ঞা'। মৈত্রেয়ীকে পরমবিজ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা.স্তী.ত্য্ অরে ব্রবীমি'—আমি বলছি কি, প্রেতির পর অর্থাৎ অনুভবের সমস্ত ভূমি উজিয়ে যাবার পর আর সংজ্ঞা থাকে না।[৭] মৈত্রেয়ী বুঝতে না পেরে বললেন, 'এ কি মোহের কথা বলছ তুমি?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না গো না, যা বললাম, তা হল বিজ্ঞানের চরম।'

ঠিক এই কথাই পাই কঠোপনিষদে: বৈবস্বত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নচিকেতার 'প্রেতে বিচিকিৎসা—অস্তী.ত্য্ একে না.য়ম্

অস্তী.তি চৈ.কে।'[৮] যম তার যা উত্তর দিয়েছিলেন, তা যাজ্ঞবল্ক্যেরই অনুরূপ। বলেছিলেন সেই অনালোক ভূমির কথা, যেখানে অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য চন্দ্র তারা কিছুরই ভাতি নাই, অথচ এইসবের ভাতি যার অনুভা।[৯] অবিদ্বানের কাছে এই প্রেতি বিততপাশ মৃত্যুর অসংজ্ঞায় ছাওয়া। কিন্তু নবেদার কাছে সেই অসংজ্ঞাই বৈবস্বত মৃত্যুর প্রদ্যোতে, বারুণী শূন্যতার পরঃকৃষ্ণতায় নীলাক্ত। সংহিতায় তাই দেখি, প্রেতির পর্যবসান সেই লোকোত্তরে যেখানে স্বধায় মাতাল দুটি রাজার দর্শন মেলে—একজন মৃত্যুর দেবতা যম, আরেকজন শূন্যতার দেবতা বরুণ।[১০]

দর্শনের এই ধারাই নেমে এসেছে বৌদ্ধপ্রস্থানে। বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নির্বাণে তথাগত থাকেন কি থাকেন না। তার উত্তরে তিনি হাঁ কিংবা না কোনটাই বলতে রাজী হননি। তাঁর আসল বক্তব্য ছিল, তথাগত তখন থাকেন না, আবার থাকেনও। অর্থাৎ তাঁর অবস্থা তখন অনির্বচনীয় দ্বৈতবুদ্ধির অগোচর। বুদ্‌বুদ যখন সমুদ্রে মিশে যায়, তখন তার দিক থেকে বলা যায়, সে থাকে না—অর্থাৎ তার বিবিক্ত সংজ্ঞা থাকে না। কিন্তু সে থাকে না বলে যে কিছুই থাকে না তা নয়, কেননা সমুদ্র তখনও থাকে; এবং বলা চলে, বুদ্‌বুদ তখন সমুদ্ররূপে থাকে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটি তো অসংজ্ঞার অবস্থাও নয়। বুদ্‌বুদের সংজ্ঞা নাই, কিন্তু সমুদ্রের সংজ্ঞা আছে। অতএব সব মিলিয়ে এটি 'নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা'র অবস্থা—বৌদ্ধপ্রস্থানে যা অরূপাবচরের প্রত্যন্তে অষ্টম ধ্যানভূমি। পতঞ্জলির সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্যোন্যসম্পর্কেও দেখি এই অনির্বচনীয়তা। অসংজ্ঞা যেমন অবিদ্যা, অসম্প্রজ্ঞানও তেমনি অবিদ্যা। কিন্তু তা নচিকেতার প্রাকৃত অবিদ্যা নয়, নবেদার লোকোত্তর অবিদ্যা।

প্রত্যয়ের এই অনির্বচনীয়তা উপচরিত হয় তত্ত্বেও। সংহিতায়

এবং উপনিষদে তার বিবৃতি পাই নানানভাবে। অস্তিপ্রত্যয়ের চরম হল সন্মাত্রের অনুভব। পরমার্থ তখন কেবল 'সৎ' : 'সদ্ এরে.দম্ অগ্র আসীদ্ একম্ এরা.দ্বিতীয়ম্।'[১১] কিন্তু অনুভবের সংবেগ এখানে এসেই থামতে চায় না। একাগ্রতা পরিব্যাপ্তই হ'ক আর সূচীমুখই হ'ক, তার স্বাভাবিক পরিণাম উপশম বা নিরোধ। যে-আলোতে সব ভাসছে, তার পিছনে দেখা দেয় কালোর নিথর রহস্য—এই মিত্রেরই 'শুক্লং ভাঃ'র পিছনে বরুণের 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্', সৎএর পিছনে 'অসৎ'। কিন্তু এই অসৎ অশক্ত নয়। উপশমের মূলে যে-আত্মধৃতি, সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে 'স্বধা', তা-ই আবার উল্লাস বা বিসৃষ্টির প্রবর্তক। তাইতে যেখানে 'ন মৃত্যুর্ আসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ', তারই মধ্যে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্'—বাতাস নাই, তবুও সেই এক স্বধায় নিঃশ্বাস ফেললেন।[১২] তখন 'অসতঃ সদ্ অজায়ত'—অসৎ হতে জন্মাল সৎ।[১৩] এই এক অপ্রতর্ক্য অনুপাখ্য বস্তুস্থিতি : পরমার্থ সৎও, অসৎও, আবার সৎও নয়, অসৎও নয়।[১৪] তখন সৎরূপে তার যে-প্রতিভান, তা বিদ্যা ; আর অসৎরূপে প্রতিভান অবিদ্যা।

সৎএর উপাসনা বিদ্যার উপাসনা, আর অসৎএর উপাসনা অবিদ্যার উপাসনা। একান্তভাবে সৎ বা অসৎএর উপাসনায় ফলভেদ হওয়া স্বাভাবিক। আর তাহতেই প্রস্থানভেদ। প্রাকৃত বুদ্ধিতে দুয়ের মধ্যে বিরোধটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। তখন শুরু হয় সদ্‌বাদী আর অসদ্‌বাদীর পরস্পরের প্রতি আক্ষেপ। তৈত্তিরীয়োপনিষদে যাঁদের অসদ্‌ব্রহ্মবাদী বলা হয়েছে,[১৫] গীতার ভাষায় তাঁদের লক্ষ্য 'ব্রহ্মনির্বাণ,' এই উপনিষদের ভাষায় 'বিনাশ', সংহিতার ভাষায় 'শূনম্ আপেঃ'।[১৬] যাঁরা সদ্‌ব্রহ্মবাদী, তাঁদের লক্ষ্য বৌদ্ধ পরিভাষায় 'আভাস্বর-

ব্রহ্মলোক', এই উপনিষদের ভাষায় 'পুরুষের কল্যাণতম রূপ', সংহিতার ভাষায় 'স্বর্ বৃহৎ'।[১৭] ছান্দোগ্যের পরিচিত ভাষায় যথাক্রমে একটি আদিত্যের 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্', আরেকটি তাঁর 'শুক্লং ভাঃ'। যাঁরা সদ্‌ব্রহ্মবাদী এবং বিদ্যার উপাসক, তাঁরা স্বভাবতই মনে করবেন, যাঁরা অসদ্‌ব্রহ্মবাদী এবং **অবিদ্যাম্ উপাসতে**, তাঁরা **অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি**—যখন তাঁরা মিত্রজ্যোতির ওপারে বরুণের ওই পরঃকৃষ্ণ নীলিমায় অবগাহন করেন। আবার অপর পক্ষ বলবেন, যাঁরা কেবল 'বিদ্যায়াং রতাঃ', তাঁরা শুধু আদিত্যের শুক্লভাতিকেই জানেন। এই বিজ্ঞানে যাঁরা তৃপ্ত, তাঁরা লোকোত্তরের অনালোক সত্যের সম্পর্কে অন্ধ। এবং তাঁদের এই অন্ধতা আরও গভীর, কেননা প্রাকৃত অবিদ্যার চাইতে যে-অবিদ্যা বিদ্যার মুখোস প'রে আসে, তার ঘোর সহজে কাটতে চায় না।

এমনি করে সদ্‌বাদী আর অসদ্‌বাদী মুখামুখি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা উভয়েই ধীর বা ধ্যানসিদ্ধ। কিন্তু তাঁদের উপাসনার ফলশ্রুতি **অন্যদ্ এব বিদ্যয়া, অন্যদ্ অবিদ্যয়া**। আমাদের কাছে এ-বিরোধ একটা সমস্যা। তার সমাধান কি ?

সমাধান তাঁরই অনুভবে, যিনি বিদ্যা আর অবিদ্যাকে **তদ্ বেদ উভয়ং সহ**—'তৎ' বলে জেনেছেন উভয়কে একসঙ্গে। সৎএর সাধন বিদ্যা—জানতে-জানতে তাঁকে বৃহৎ করে পাওয়া ; আর অসৎএর সাধন অবিদ্যা—সব জানার ইতিতে অপ্রকেত শূন্যতায় তাঁকে পাওয়া। দুয়ে মিলে তাঁর অখণ্ড স্বরূপের প্রতিবোধ। তাঁর 'শুক্লং ভাঃ' আর 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্'এর যুগপৎ বিজ্ঞান—যেমন নিত্যদৃষ্ট ওই আদিত্যবিম্বে, তার প্রভাস্বর ব্যাপ্তিতে আর তারই সঙ্গে অবিনাভূত আকাশের বর্ণোত্তরতায়। সংহিতায় একটির দেবতা মিত্র, আরেকটির বরুণ। দুয়ের যুগনদ্ধতা প্রসিদ্ধ। তাই দুয়ের সহবেদনও অপরিহার্য।

এই সহবেদন যাঁর হয়েছে, তাঁর বুদ্ধি উত্তীর্ণ হয়েছে প্রতিবোধ বা অখণ্ডৈকরসাবগাহিতায়। তিনি অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে—অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুতীর্ণ হয়ে বিদ্যার দ্বারা সম্ভোগ করেন অমৃত। এই মৃত্যুতরণ জিজীবিষারই নামান্তর। জীবনের পূর্বাহ্নে প্রাণ উর্ধ্বস্রোতা, জিজীবিষা সতেজ। কিন্তু মধ্যাহ্নের পরেই শুরু হয় প্রাণের অবক্ষয়—এটা প্রাকৃত জগতের আইন। এই অবক্ষয়কে রোধ করবার জন্যই প্রতিবুদ্ধ মর্ত্যের মধ্যে জাগে অমৃতের পিপাসা, মৃত্যুতরণের প্রয়াস।

এ-প্রয়াস কোন্ ভূমিতে সার্থক হয়, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তার একটা বিবৃতি আছে। ব্রাহ্মণ বলছেন, আদিত্যের নীচে যেসব লোক আছে, তারা সামান্যত 'উরুলোক' কিন্তু আদিত্যের ওপারে আছে 'ররীয়াংসো লোকাঃ'। নীচের লোকগুলি অন্তবান্ এবং ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু ওপারের লোক অনন্ত অপার এবং অক্ষয়। যিনি নাচিকেত-অগ্নিচয়ন করেন, তিনি এই অক্ষয় লোকে প্রতিষ্ঠিত হন। রথের উপরে থেকে রথী যেমন দেখে রথের দুদিকে দুটি চাকা ঘুরছে, তেমনি আদিত্যমণ্ডলের উর্ধ্বে থেকে তিনি দেখেন অহোরাত্রের আবর্তন হচ্ছে তার নীচে, অহোরাত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না।[১৮] এই হল কালজয় বা মৃত্যুতরণ অথবা অমৃতত্বলাভ।

ব্রাহ্মণের এই বিবৃতিতে মৃত্যু আর অমৃতত্বের অন্যোন্যসম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখছি, চেতনার একটা অবরভূমি রয়েছে, সেখানে জীবন মৃত্যুগ্রস্ত। সেখানে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চলছে অহোরাত্রের মত, জিজীবিষা সেখানে পরাস্ত। অমৃতত্ব আছে এই আবর্তনের উর্ধ্বে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে হলে ওই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই পথ কেটে চলতে হয়। প্রাকৃত মৃত্যুর পরিচয় যে-অন্ধ-তমিস্রায়, জীবনের প্রত্যন্তে দাঁড়িয়ে চেতনার সব দীপ নিবিয়ে দিয়ে

সেই অনালোকের মধ্যেই ঝাঁপ দিতে হয়। এ যেন আলো হতে অন্ধকারের মধ্যে এসে আলোকনিরপেক্ষ দৃক্‌শক্তির স্বধা দিয়ে এমন-এক অনির্বচনীয় জ্যোতিকে আবিষ্কার করা—আলো আর কালো দুইই যার অনুভা।

এই হল মৃত্যুর আরেক রূপ—যে-মৃত্যু প্রাকৃত মৃত্যু নয়, আবৃত্তচক্ষু ধীরের বৈবস্বত মৃত্যু। সংহিতায় কুমার যামায়নকে এবং ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে নচিকেতাকে দেখি প্রেতির চরম পর্বে তাঁর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে।[১৯] এই উপনিষদেই তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রাজাপত্য সূর্যের ওপারে যমরূপে—পূষার সন্ধানী আলো যাঁর দৃষ্টিতে।[২০] তাঁর মধ্যে 'ন দিবা ন রাত্রির্ ন সন্ ন চাসন্[২১] : ন সংজ্ঞা না.সংজ্ঞা'—কোন-কিছুরই ভান নাই বলে এক অনির্বচনীয় দিব্য অবিদ্যাই তাঁর উপলব্ধির সাধন।

এই অবিদ্যা নিয়ে মৃত্যুতে অবগাহনই চরম মৃত্যুতরণের একমাত্র উপায়। তখন সবই অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অথচ সেই 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত' হয় বিদ্যার প্রদ্যোত—রাতের কালো হতে উষার আলোর মত। তা-ই দিয়ে জানতে পারি 'সতো বন্ধুম্ অসতি'[২২]—সৎএর বোঁটার যে-বাঁধন রয়েছে অসৎএ, অমৃতের উৎস রয়েছে বৈবস্বত মৃত্যুর গহনে। তখন বুঝতে পারি মৃত্যুকে না জেনে জিজীবিষার যে-তর্পণ, তা অমৃত নয়—তা মূঢ় প্রমত্ত এবং মৃত্যুর বশ।[২৩] প্রাকৃত জীবন-মৃত্যুর উজানে বৈবস্বত মৃত্যুর বিজ্ঞানই দিতে পারে সর্বাস্তিমূল অমৃতের অধিকার। এই মৃত্যুকে জেনেই অবিদ্যা এবং বিদ্যার সহবেদনে নচিকেতা হন নবেদা বা পূর্ণপ্রজ্ঞ।

এই ভাবনারই অনুবৃত্তি চলছে দ্বিতীয় মন্ত্রগুচ্ছে। কিন্তু এখানে দৃষ্টি অধ্যাত্ম, আর সেখানে অধিদৈবত বা অধিবিশ্ব। একটিতে প্রশ্ন উঠেছে সাধনসম্পর্কে, আরেকটিতে সাধ্যসম্পর্কে। বিদ্যা দিয়ে যদি

সম্ভূতিকে পাই, আর অবিদ্যা দিয়ে পাই অসম্ভূতিকে—দুয়ের ফল কি আলাদা হবে? সাধনার দুটি ধারা কি পৃথক্ রাখতে হবে? বলা বাহুল্য, এখানেও সমস্যার সমাধান করা হয়েছে সহবেদনের আদর্শ সামনে ধরে।

সংহিতায় পাই 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'—এই সব-কিছু একেরই বিভূতি,[২৪] তিনিই রূপে-রূপে এই সব-কিছু হয়েছেন। কিন্তু এই বিচিত্র জগৎ যাঁর বিভূতি, তাঁর স্বরূপ কি? তিনি কি সম্ভূতি, না অসম্ভূতি? বিভূতির মূলে শক্তির যে-সংহনন, তা-ই সম্ভূতি—আদিত্যের রশ্মিজালের মূলে তেজঃপুঞ্জের মত। সংহিতায় তাকে বলা হয়েছে 'বাক্'—যিনি বিশ্বভুবনকে জড়িয়ে ধরে ঝড়ের মত বয়ে চলেছেন এই দ্যাবাপৃথিবীকে ছাপিয়ে, আবার আপন মহিমায় এইসব হয়েছেনও।[২৫] এই উপনিষদের গোড়াতেই তাঁকে আমরা পেয়েছি 'জগতী' বা বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবতার ছন্দরূপে। কিন্তু তাঁকেও ছাপিয়ে রয়েছেন 'অনেজৎ একম্'—যিনি অক্ষর, যিনি অসম্ভূতি অর্থাৎ যাঁ থেকে কিছুই হয় না, যিনি পূর্ণ এবং অপ্রবর্তী আকাশের মত।[২৬] স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এই সম্ভূতি সংহিতার 'সৎ', আর অসম্ভূতি 'অসৎ'।

আগেই দেখেছি অসৎ হতে সৎএর জন্ম, একথা সংহিতায় আছে। অসৎ না সৎ কোন্‌টি বিশ্বমূল এ নিয়ে মতভেদের উল্লেখ ছান্দোগ্যে পাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখি কেউ ব্রহ্মকে জানছেন অসৎ বলে, কেউ-বা সৎ বলে। শ্বেতাশ্বতরে 'কেবল শিব'—সৎও নন, অসৎও নন। মুণ্ডকে ব্রহ্ম অসৎ এবং সৎ দুইই।[২৭] এই উপনিষদে সম্ভূতি আর অসম্ভূতির দ্বন্দ্ব একই রীতিতে, একই বিষয় নিয়ে। বিদ্যা আর অবিদ্যার দ্বন্দ্বের সমাধান যেভাবে করা হয়েছে, এ-দ্বন্দ্বের সমাধানও করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে; সম্ভূতি আর বিনাশ দুটিকে মিলিয়ে নিয়ে 'তৎ'কে যিনি জেনেছেন, তাঁর তত্ত্ববিদ্যাই

সম্যক্। বিনাশ দিয়ে তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতকে সম্ভোগ করেন সম্ভূতি দিয়ে। বিশ্বমূল অসম্ভূতি বা বিনাশ স্বরূপত মৃত্যুতীর্ণ, সংহিতার ভাষায়, 'অতিষ্ঠাঃ' পুরুষের বিশ্বোত্তর ত্রিপাদ 'অমৃতং দিবি' —দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে।[২৮] সম্ভূতি তারই বিসৃষ্টি এবং তাও অমৃত—পরমদেবতার সে সেই সুদর্শন কাব্য, যা কখনও মরে না বা জরাগ্রস্ত হয় না।[২৯] যিনি লোকোত্তরে অমৃতের উৎসকে আবিষ্কার করে আবার এই লোকে তাকে নামিয়ে এনে সম্ভোগ করতে পারেন, তিনিই কৃতার্থ। তিনি 'প্রথমজা ঋতাংস্য, পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাভায়ি।'[৩০]

এখানে অসম্ভূতিকে বলা হয়েছে 'বিনাশ'। শব্দটি এসেছে 'নশ্' ধাতু থেকে। সংহিতায় তার দুটি অর্থ—এক 'লুপ্ত হওয়া', আরেক 'লক্ষ্যে পৌঁছন, পাওয়া'। এখানে দুটি অর্থই এসে গেছে, তাই শব্দটি শ্লিষ্ট। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে 'বিনশন' তীর্থের কথা আছে।[৩১] সরস্বতীর ধারা সেখানে মরুভূমিতে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই তীর্থের ওই নাম। কিছু দূরে ফল্গুধারা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।[৩২] সরস্বতী প্রাণ ও প্রজ্ঞার ধারা, তার উজান বেয়ে আমরা পৌঁছতে পারি স্বর্গে বা আদিত্যে।[৩৩] সরস্বতী মরুভূমিতে হারিয়ে গেল, তারপর সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছল—দুইই তার 'বিনশন' বা 'বিনাশ'। এর মধ্যে এখানকার অসম্ভূতি-সম্ভূতির ছবিটি ধরা রয়েছে। মরুভূমিতে ধারার হারিয়ে যাওয়া হল অসম্ভূতি—অপ্রাকৃত অবিদ্যা তার সাধন। আর সমুদ্রে পৌঁছলে ধারার ব্যাপ্তি বা প্রচেতনা[৩৪]—তা-ই সম্ভূতি ; বিদ্যা তার সাধন। ধারার গতিপথের বর্ণনায় সংহিতায় আছে, 'নদীদের মধ্যে একা সরস্বতীই শুচি ও চেতনা—চলেছে গিরি হতে, চলেছে সমুদ্র হতে।'[৩৫] সমুদ্র হতে চলা উজানধারায়, ব্রাহ্মণের বিনশনতীর্থের দিকে—যেখান থেকে দিনে-রাতে চুয়াল্লিশ দিন ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে পাওয়া যায়

'প্লক্ষপ্রাস্রবণ' বা নিত্যনির্ঝরিত একটি পাকুড় গাছ। এই গাছটি অমৃতনির্ঝর ব্রহ্মবৃক্ষ, একে আমরা চিনি। ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে, পৃথিবী থেকে স্বর্গও ততখানি দূরে।[৩৬] সেখান থেকে আবার ভাটিয়ে এসে সমুদ্রে পড়া—এই পৃথিবীর প্রাচেতস প্রাণের সমুদ্রে, এই সম্ভূতিতে। একদিক দিয়ে এও 'বিনশন'—সবার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সর্বাত্মভাবের নিবিড়তায় এই মৃত্যুর লীলায়নের মধ্যেই অমৃতসত্তার সম্ভোগ।

উপনিষদের দ্বিতীয় পর্ব এইখানে শেষ হল। তারপর চারটি মন্ত্রে তৃতীয় পর্ব।[১] এই পর্বে মন্ত্রের সংখ্যা পাঠ ও বিন্যাস নিয়ে কাণ্বশাখার সঙ্গে মাধ্যন্দিন শাখার কিছু ভেদ আছে। পর্বের শেষে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

পর্বের চারটি মন্ত্রই প্রার্থনার মন্ত্র। প্রথম দুটি মন্ত্রে প্রার্থনা পূষার কাছে, শেষের দুটিতে অগ্নির কাছে। লক্ষণীয় মাধ্যন্দিনশাখার মন্ত্রপাঠে প্রার্থনা কেবল অগ্নির কাছেই, পূষাকে সেখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই পর্বটিকে সাধারণত যোগীর মৃত্যুকালীন প্রার্থনা বলে গণ্য করা হয়। ঋক্‌সংহিতার একটি মন্ত্রে অগ্নি আর পূষা সহচরিত। যে-তৃচে মন্ত্রটি আছে, তা পুরুষের মৃত্যুর পর উৎক্রান্তির বর্ণনা।[২] তার সঙ্গে এখানকার ভাবসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। সুতরাং এখানেও উৎক্রান্তির কথাই হচ্ছে—এ-প্রকল্প অসঙ্গত নয়।[৩] কিন্তু মন্ত্রগুলির অন্য দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাও সম্ভব। বাজসনেয়ীদের একটি মন্ত্রে আছে, 'দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি'। সায়ণ তার ব্যাখ্যায় বলছেন, 'ইহৈব জন্মনি সাক্ষাৎকারো দেবভাবঃ, মরণাদ্ ঊর্ধ্বং দেবত্বাপত্তির্ দেবাপ্যয়ঃ।' কেনোপনিষদেও পাই, 'ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যম্ অস্তি।'[৪] অমৃতত্বের সম্ভোগ এইখানেই। জিজীবিষার পরম আপ্যায়ন যদি এই উপনিষদের মর্মরহস্য হয়ে থাকে, তাহলে এই

পর্বটিকে মুমূর্ষুর প্রার্থনা না বলে মৃত্যুঞ্জয়ের উদানগাথা বলাই সঙ্গত—নইলে সমগ্র উপনিষদের উঁচু সুরটি হঠাৎ খাদে নেমে আসে। শুক্লযজুর্বেদের পরিশেষ হিসাবে তা সমীচীনও হয় না। মাধ্যন্দিনমন্ত্রপাঠে পূষাকে বর্জন করার ইঙ্গিতও এইদিকেই। ঋক্‌সংহিতার উৎক্রান্তিমন্ত্রগুলিতে পূষাই প্রধান। তাঁকে বাদ দিলে এখানে উৎক্রান্তির দ্যোতনা দুর্বল হয়ে পড়ে, কেননা তখন দেবতাদের মধ্যে থাকেন শুধু অগ্নি আর আদিত্য, যাঁদের সহচার অমৃতসন্ধ জীবনের প্রধান উপজীব্য। পূর্বাপর ভাবের সঙ্গতি রাখবার জন্য মন্ত্রগুলিকে আমরা যেভাবে বুঝতে চাই, তাতে উৎক্রান্তিপক্ষ বাধিত হয় না—গৌণ হয় মাত্র। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বেদে 'প্রেতি' সংজ্ঞাটি শ্লিষ্ট, তার ইশারা অবিদ্বানের প্রাকৃত মৃত্যু এবং বিদ্বানের বৈবস্বত মৃত্যু—দুইদিকেই।

দুটি পর্বে গেল ধীরদের অনুশাসন এবং তত্ত্বের ব্যাখ্যান। এইবার শেষপর্বে সাধনা ও সিদ্ধির বিবৃতি। আগের মন্ত্রগুলি যেন প্রবচন, আর এগুলি অনুবচন।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যা.পিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বম্ পূষন্ন্, অপাবৃ্ণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫

—হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে ঢাকা সত্যের মুখ। তা তুমি, হে পূষন্, অপাবৃত কর সত্যধর্মার কাছে—দেখব বলে।

এইবার শুরু হল চেতনার উজান বেয়ে চলা। তাকে 'পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ'[৫] এই পৃথিবী হতেই সাতটি ধাম পার হয়ে পৌঁছতে হবে সেই অসূর্যলোকে, যেখানে বারুণী রাত্রির অনালোক শূন্যতা। সেই অব্যক্তের অনুভারূপে প্রাজাপত্য সূর্যের প্রকাশ ওই আকাশে, যার হিরণ্যজ্যোতি বিশ্বভুবনের ধারক কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পরমসত্যের আবরক। এই সূর্যদ্বার ভেদ করে, এই আলোর আড়াল ঘুচিয়ে

পৌঁছতে হবে সেই অবর্ণ সত্যে যেখান হতে বিশ্বের বিচিত্র বর্ণের বিচ্ছুরণ। এই উজানপথের দিশারী হলেন পূষা। এই মন্ত্রে তাঁরই কাছে আকুল প্রার্থনা : 'হিরণ্ময় পাত্রের আড়ালে সত্যের মুখ ঢাকা। তুমি ঘোচাও সে-আবরণ, আমি দেখি।'

আলোর আড়ালে সত্যের মুখ ঢাকা—এই ভাবনার বীজ ঋক্-সংহিতায় আছে। ঋষি শ্রুতবিদ্ আত্রেয় মিত্রাবরুণকে সম্বোধন করে বলছেন, 'ঋত দিয়ে তোমাদের ধ্রুব ঋত ঢাকা রয়েছে সেইখানে, যেখানে সূর্যের অশ্বদের বিমুক্ত করেন দেবতারা। সূর্যের হাজার কিরণ সেখানে স্থির রয়েছে একসঙ্গে। দেবতাদের আশ্চর্যের সেরা "একং তৎ"কে আমি দেখলাম সেইখানে।'[৬] এ সেই লোকোত্তরের বর্ণনা, যেখানে সূর্য ভায় না—পরমসত্যের রহস্য যেখানে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে রয়েছে অবরসত্যের সৌর প্রতিভাসে। মিত্র ঢেকে রেখেছেন যেন বরুণকে, আলোর মায়ায় কালোর রহস্যের প্রতি আমরা অন্ধ।

এই ভাবনার অনুবৃত্তি দেখতে পাই 'ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপের' প্রসঙ্গে। ত্বষ্টা বিশ্বশিল্পী। কারণসলিলকে তক্ষণ করে বিশ্বকে রূপ দিয়েছেন বলে তিনি 'ত্বষ্টা'। আবার এ তাঁর আত্মরূপায়ণ বলে তিনি 'বিশ্বরূপ'। তাঁর পুত্র ত্বাষ্ট্রও বিশ্বরূপ। কিন্তু সে 'বৃত্র', সে অসুর। তাই ইন্দ্রের তাকে হত্যা করতে হল। কাহিনীর তাৎপর্য এই, এদিক থেকে দেখছি যখন, তখন এ-বিশ্বরূপ বৃত্র বা আসুরী মায়া—পরমসত্যকে সে আড়াল করে রাখে। তাই রূপের মায়া সরিয়ে ডুবতে হয় অরূপে। সেই অরূপ থেকে রূপকে যখন উৎসারিত দেখি, তখনই সত্যকে দেখি—দেখি দেবতার 'কল্যাণতম রূপ'।[৭]

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ : পাত্র আধার, যার মধ্যে সব-কিছু আছে—যেমন শৌনকসংহিতায় এই পৃথিবীকে বলা হয়েছে 'ভুজিষ্যং পাত্রং

নিহিতং গুহা'—গুহাহিত একটি পাত্র, যা আমাদের সমস্ত ভোগের আধার।[৮] তেমনি এমন-একটি হিরণ্ময় পাত্র ওই প্রাজাপত্য সূর্য, 'য়েনে.মা ৱিশ্বা ভুৱনান্য্‌ আভৃতা ৱিশ্বকর্মণা ৱিশ্বদেৱ্যাৱতা'—যিনি এই বিশ্বভুবনকে ধরে আছেন বিশ্বকর্মা হয়ে বিশ্বদেবতার মহিমায়।[৯] হিরন্ময় শব্দটি এখানে প্রতীকী। ঐতরেয় এবং শতপথব্রাহ্মণে অসুরদের তিনটি পুরী নির্মাণের কথা আছে[১০]—পৃথিবীতে আয়সী, অন্তরিক্ষে রাজতী আর দ্যুলোকে হিরণ্ময়ী। তিনটি ধাতুর সঙ্গে সাংখ্যের তিনটি গুণের তুলনা চলে। হিরণ্য সত্ত্বগুণ। ন্যায়ের ভাষায় সে তৈজস, তাই স্বভাবত সে অম্লান। তবুও সে রঙ্‌ছুট নয়। দেবতারা তিনটি পুরকেই ভেঙে দিলেন। চেতনা তিনগুণের ঊর্ধ্বে উঠল, অবর্ণ হল। এই ত্রিপুরনাশের কথা পুরাণেও আছে, সপ্তশতীতেও দেবীর তিনটি চরিত্রে অসুরবধের একই তাৎপর্য। সত্ত্বগুণ হিরণ্ময়, সে সোনার শিকল; গীতাতে তাকেও বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে।

প্রাজাপত্য সূর্য এই সত্ত্বগুণের আধার বলে হিরণ্ময় পাত্র। সংহিতার ভাষায় তিনিও সত্য, কিন্তু 'ধর্মন্‌ দিৱো ধরুণে সত্যম্‌ অর্পিতম্‌'—যে-ধর্ম দ্যুলোকের ধারক, তাতে অর্পিত বা স্থাপিত সত্য।[১১] এখানে যাকে 'ধর্ম' বলা হয়েছে, তা-ই এ-মন্ত্রের সত্য। বৃহদারণ্যকেও পাই, যা ধর্ম তা-ই সত্য।[১২] এই সত্য সেই বিশ্বোত্তর অবর্ণ, বিশ্বভুবন যার প্রতিভাস।

প্রাজাপত্য সূর্যের হিরণ্ময় আড়াল ঘুচিয়ে পৌঁছতে হ'বে সত্যে। পূষা তখন আমাদের দিশারী। বেদে পূষা দ্যুস্থান দেবতা। নিরুক্তকার যাস্ক আদিত্যের উদয়নের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করেছেন।[১৩] এই উদয়ন বিষ্ণুর সপ্তপদী অর্থাৎ অন্ধতামিস্র হতে সাতটি পদক্ষেপে উত্তমজ্যোতিতে তাঁর উঠে যাওয়া। সাতটি পদক্ষেপে সাতটি ধাম। আদি ধাম মধ্যরাত্রের গহনে—যখন আদিত্যদ্যুতির উন্মেষ নাই,

কিন্তু তার প্রেষণা আছে। এই ধামের দেবতা 'অশ্বিদ্বয়'—তাঁদের একজন তমোভাগ, আরেকজন জ্যোতির্ভাগ। যতক্ষণ আলোর কোন নিশানাই নাই কিন্তু তার ছোটবার সংবেগ আছে, ততক্ষণ তমোভাগ অশ্বীর অধিকার। তিনি যেন কালো ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন আলোর দিকে। তারপর ভোরের দিকে অন্ধকারকে তরল করে যখন আকাশ ধূসর হয়ে ওঠে, তখনকার অশ্বী জ্যোতির্ভাগ। তার পরের ধামে 'উষা'। ধূসর আলো তখন অরুণ হয়ে আদিত্যের উদয়নের নিশ্চিত আশ্বাস আনে। তার পরে 'সবিতা'। আদিত্যদ্যুতি তখন দিক্‌চক্রবালের নীচে থেকেও আকাশকে উদ্ভাসিত করে। একে চেতনায় শুদ্ধসত্ত্বের উদ্রেক বলা যেতে পারে। তারপর আদিত্যবিম্বের উদয় হলে দেবতা 'ভগ'। তিনি বালসূর্য বা ভাগবতদের বালগোপাল। তিনি কিশোর হলে তাঁর নাম হয় 'সূর্য'। রশ্মিজালে পুষ্ট হয়ে কিশোর সূর্য তরুণ হলে হন 'পূষা'। তাঁরও উর্ধ্বে মধ্যগগনে 'বিষ্ণু'—সংহিতায় যিনি 'যুবাঃকুমারঃ'।[১৪] লোকদৃষ্টিতে সূর্য জনলোকে, পূষা তপোলোকে, বিষ্ণু সত্যলোকে। তিনি যেমন ছান্দোগ্যের 'শুক্লং ভাঃ', তেমনি আবার 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্'। পুরাণে তাই তাঁর নীল বক্ষে কৌস্তুভের শুক্লচ্ছটা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিষ্ণু ব্যাপ্তিচৈতন্য, সূর্য প্রাণ—সংহিতায় 'জীবো অসুঃ'[১৫] ; আর পূষা দুয়ের মধ্যে অগ্র্যা বুদ্ধির সন্ধানী আলো। সংহিতায় তাঁর এক সংজ্ঞা 'অনষ্টপশুঃ'।[১৬] পশুকে তিনি নষ্ট হতে দেন না। পশু প্রাণের প্রতীক। প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে থাকলে পূষা তাকে পুষ্ট করেন। অথবা অব্যক্তে হানা দিতে গিয়ে সে যদি হারিয়ে যায়, পূষা তাকে ফিরিয়ে আনেন। যোগের ভাষায় তাঁর স্থান আজ্ঞাচক্রের বিন্দুচেতনায় বা ডমরুমধ্যে, যেখান থেকে উর্ধ্বে এবং অধে দুটি ত্রিকোণের বিস্তার। পূষা বিষ্ণুকে ছুঁয়ে আছেন ; একর্ষির সঙ্কর্ষণশক্তিতে তিনি সূর্যদ্বারের ভিতর দিয়ে চেতনাকে টেনে তোলেন। সংহিতার বর্ণনায় তিনি তখন 'সবিতা'।[১৭]

এই পূষা আমাকে জীবনযজ্ঞের তৃতীয়সবনে লোকদ্বার অপাবৃত করে নিয়ে যাবেন সেই স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধিকারে—যেখানে শুক্লতাকে ছাপিয়ে বিষ্ণুর পরঃকৃষ্ণ নীলিমা, অব্যক্তের দেবতা বরুণের 'ঋতেনাপিহিতং ঋতং ধ্রুবম্', অথবা বরুণই স্বয়ং 'নি ষসাদ··· সাম্রাজ্যায়···বিভ্রদ্ দ্রাপিং হিরণ্যয়ং···বস্ত নির্ণিজম্'—বসে আছেন সাম্রাজ্যের তরে, হিরণ্ময় কবচ গায়ে, নির্ধৌত প্রাবরণ প'রে।[১৮] পরমসত্যের এই রূপ। এই সত্যই আমার ধর্ম বা স্বভাব। তাইতে আমি **সত্যধর্ম** (1)। অথবা আমি বিষ্ণুই,[১৯] যিনি ওই তাঁর পরমপদ হতে ধরে আছেন সকল ধর্ম।[২০]

তার পরের মন্ত্রটিও পূষার কাছে প্রার্থনা, তাতে উজানধারারই বিবৃতি—সাধন ও সিদ্ধির বিস্তৃত পরিচয় সহ।

পূষন্ন্ একর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।
যো ঽসাব্ অসৌ পুরুষঃ সো ঽহম্ অস্মি॥ ১৬

—হে একর্ষি পূষন্, হে যম, হে প্রাজাপত্য সূর্য, ব্যূহ রচ রশ্মিদের সমূহ রচ তেজের। তোমার যে-রূপ কল্যাণতম, তা তোমার দেখি। ওই ওই যে-পুরুষ, আমি হচ্ছি সে-ই।

প্রথমেই চেতনার উত্তরণের তিনটি পর্বে পূষার তিনটি সম্বোধন। এগুলিকে বিলোমক্রমে নিলে উত্তারপথের বিবৃতি সুবোধ হবে।

তাহলে প্রথম সম্বোধন, হে প্রাজাপত্য সূর্য। এই প্রাজাপত্য সূর্য আগের মন্ত্রের 'হিরণ্ময় পাত্র'। সূর্য প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতিরই একটি বিভাব। সংহিতায় প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ—যিনি ছিলেন সবার আগে, এবং জাত হয়েই সর্বভূতের একমাত্র পতি হলেন, অমৃত এবং মৃত্যু দুইই যাঁর ছায়া, যিনি সমস্ত দেবতার

অধীশ্বর একদেব, যিনি সত্যধর্মা, 'যত্রা.ধি সূর উদিতো বিভাতি'— যাঁর মধ্যে সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়ান।[১] সুতরাং এই সূর্য তাঁর তনুভা। উপাসনার প্রথম পর্বে এই 'জীবন্ত স্ফুরন্ত জ্যোতি'ই আমাদের উপাস্য।[২] আর্যেরা 'জ্যোতিরগ্র',[৩] আর অধিভূতদৃষ্টিতে সূর্যেই জ্যোতিঃসত্তার চরম প্রকাশ। অধিভূত সূর্যকে অধিদৈবতজ্ঞানে অধ্যাত্মপ্রত্যক্ষের বিষয় করাই বৈদিক সাধনার মূলে।

ইতিভাবনার চরমে সূর্য—তাঁকে যে-রূপেই দেখি না কেন। কিন্তু তৎস্বরূপের তত্ত্বকে ইতিভাবনার দ্বারা নিঃশেষিত করা যায় না। একদিকে যেমন সূর্যের উদয়, আরেকদিকে তেমনি তাঁর অস্তময়ন। অনুভব অখণ্ড হয় দুটিকেই নিতে পারলে। তাই ইতির পরে আসে নেতির তাগিদ। তখন সত্যৈষণার তীব্রসংবেগে বলে উঠি, 'হে পূষন, ঘোচাও ওই আলোর আড়াল, আমাকে সত্যের মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দাও।'

প্রাজাপত্য সূর্যের বিস্ফারণ গুটিয়ে আসে দক্ষিণ অক্ষির প্রত্যন্তে বা ভ্রূমধ্যের বৈন্দবচেতনায়।[৪] অথবা অহনার সৌরদীপ্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় নক্তার তিমিরগহন হৃদয়ে। যেন জাগ্রতের পরে নেমে আসে সুপ্তির ছায়া, জীবনের পরে মৃত্যুর। সংহিতার ভাষায়, আত্মস্থিতির অবর্ণ জ্যোতির ইঙ্গনে ফুটে ওঠেন যম অথবা বরুণ। বারুণী রাত্রির সব-ছাওয়া নিথরতায় নচিকেতা এসে অতিথি হয় বৈবস্বত মৃত্যুর ঘরে।

ইতিভাবনার প্রত্যন্তে চেতনার উত্তরণের এই দ্বিতীয় পর্ব— নিগূঢ় এষণার বিদ্যুৎসূচীতে অনুবিদ্ধ এক নেতির অমানিশা। অতলের সঙ্কর্ষণে রুদ্ধশ্বাস প্রাণনের সংবেগে তখন পথ চিরে-চিরে চলা। এক অনালোক আলোকে ছাওয়া মহাশূন্যতার ভিতর দিয়ে সে-পথ। ঋতুচক্রের আবর্তন নাই, কাল স্তব্ধ। আদিত্যের মাধ্যন্দিন দীপ্তি মেদুর হয়েছে সোম্যসুধার ধূসর আলিম্পনে। তারই

মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিকে যেন অপথের হাতছানি। ছান্দোগ্য আর বৃহদারণ্যকে বর্ণিত এই 'দেবপথ ব্রহ্মপথে'র পথিকের দিশারী সেই একর্ষি পূষা—যিনি 'পুরুষো ঽমানবঃ' বা 'পুরুষো ঽমানসঃ'।[৫] সংবৎসর বা ঋতুচক্রের আবর্তনেই প্রাজাপত্য সূর্যের অধিকার সমাপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর আলো আর পূষার বিদ্যুচ্চকিত দীপ্তির মধ্যে সন্ধিবন্ধন করছে ওই যাম্য প্রদোষচ্ছায়া।

এই পূষা 'একর্ষি' কিনা একমাত্র ঋষি। বিশেষণটির মধ্যে অদ্বৈতভাবের ব্যঞ্জনা আছে, যেমন আছে সংহিতার 'একবীর', 'একব্রাত্য' বিশেষণে।[৬] 'ঋষি' শব্দটি শ্লিষ্ট, এসেছে ঋষ্ ধাতু হতে যার অর্থ চলা, বিদ্ধ করা, দেখা—তিনটিই হতে পারে। তাইতে সংজ্ঞাটি বোঝাচ্ছে অগ্র্যা বুদ্ধির সূচীমুখ দৃক্‌শক্তি, যা অব্যক্তের গহনে নিকষে সোনার রেখার মত ঝিকিয়ে ওঠে। সংহিতায় একর্ষির এই পরিচয় : স্কম্ভব্রহ্মে তিনি অর্পিত বা সংহত,[৭] যমকে জানলেই একর্ষির সাধর্ম্য লাভ হতে পারে।[৮] বৃহদারণ্যকের বংশব্রাহ্মণে দেখি, ব্রহ্মবিদ্যা একর্ষি থেকে সঞ্চারিত হল প্রধ্বংসনে, প্রধ্বংসন থেকে যমে, যম থেকে অথর্বায় ইত্যাদি ;[৯] অর্থাৎ তাঁর বিজ্ঞান যেন নবেদার বিজ্ঞান, আঁধার পেরিয়ে অনির্বচনীয়ের প্রচ্ছটা। প্রশ্নোপনিষদে প্রাণব্রহ্ম ব্রাত্য এবং একর্ষি।[১০]

অন্ধকারের মধ্যে পূষার সন্ধানী আলোর চকিত উদ্‌ভাস—এই হল চেতনার উত্তরায়ণের তৃতীয় পর্ব। তিনটি পর্বে তিনটি দেবতা একই পরম দেবতার তিনটি বিভাব—কাণ্বসংহিতায় যিনি 'আদিত্যে পুরুষঃ', মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে 'বিষ্ণু', আর এই উপনিষদে 'সত্য'স্বরূপ। সে-সত্য বিষ্ণুর পরম পদে—যা ঔর্ণবাভের মতে বিষ্ণুপদের মাধ্যন্দিন দীপ্তিরও ওপারে 'গয়শিরসি' বা লোকোত্তরের সেই তুঙ্গতায়, যেখানে অনালোকের 'পাংসুর' নীহারিকায় বিশ্বভুবনের 'সমূহন'।[১১]

মহাজীবন আর মহামরণের ওপারে, যেখানে 'ন রাত্র্যা অহ্নঃ প্রকেতঃ'—রাতের আঁধার বা দিনের আলোর কোন নিশানাই নাই, সেইখানে পূষার জ্যোতিরুদ্ভাসে দেখতে চাই সত্যের মুখ। হে দেবতা, **ব্যূহ রশ্মীন্**—দিগ্‌বিদিকে পরিকীর্ণ চেতনার রশ্মিজালে তোমারই প্রভাস, ঋতের ছন্দে তাদের গুছিয়ে নাও; **সমূহ তেজঃ**—অগ্র্যা ধী-র সঙ্কর্ষণে হৃদয়ের হিতা নাড়ীতে তাঁদের সংহত কর সূচীমুখ তীক্ষ্ণতায় বিদ্যুদৃষ্টির শাণিত ফলকের মত। তারই প্রদ্যোতে অচিত্তির আড়াল ঘুচিয়ে এবার **যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি**—অরূপ আর রূপের, বিনাশ আর সম্ভূতির আশ্চর্য সমাহারে তোমার যে-রূপ কল্যাণতম, তা-ই আমি দেখি।

সংহিতার ভাষায় এটি একটি 'পরমা সংদৃক্'—পরম দর্শন এবং সম্যক্ দর্শন। সম্ভূতিতে তাঁর একটি দর্শন, যখন রূপে-রূপে দেখি তাঁর প্রতিরূপ। আর এ-দর্শনে তাঁর সর্বাতীত অনির্বচনীয়তার পরিচয়, সবার উজানে সেই দেখা যাকে ছাপিয়ে আর কিছুই নাই।[১২] অপ্রবুদ্ধ চিত্তের কাছে বিশ্বরূপে তাঁর স্বরূপ শতরূপা মায়ায় আড়াল হয়ে আছে। বাউলের মত অরূপের 'রসের তিমিরে নয়ন ডুবিয়ে' এ-আড়াল ভাঙ্‌তে হবে। তারপর সেই অরূপ হতে প্রতিরূপের উৎসারণে রূপ আর অরূপের মোহানায় দাঁড়িয়ে তাঁর স্বরূপের যে-দর্শন, তাতেই তাঁর শিবতম রূপের অভিজ্ঞান, হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে দেখা সত্যের মুখ।

আমার দর্শন, আর তাঁর আবেশ। 'ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকম্ অত্রা বিবেশ'—ঈশান যিনি, বিশ্বভুবনের রাখাল, সেই ধীর অপ্রজ্ঞ আমার মধ্যে আবিষ্ট হলেন এইখানে, এই আধারে।[১৩] সে-আবেশে বিগলিতবেদ্যান্তর আমার রূপান্তর—তাঁর রূপে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় 'সে-রূপ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্‌মা অভয় রূপ।' সে কেমন? না 'যেমন প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা সম্পরিষ্বক্ত

হয়ে পুরুষ না জানে বাইরের না অন্তরের কিছু, তেমনি এই পুরুষও প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা সম্পরিষ্বক্ত হয়ে না জানে বাইর বা অন্তর। তখন তার আপ্তকাম আত্মকাম অকাম অশোক রূপ।'[১৪]

আর সেই সম্পরিষ্বঙ্গের সান্দ্র সংবিৎ হতে উদ্গত এই ব্রহ্মঘোষ : য়ো ঽসাব্ অসৌ পুরুষঃ সো ঽহম্ অস্মি—ওই ওই যে-পুরুষ, আমি হচ্ছি সেই।

এই হল সত্যের দর্শন ও সম্ভোগ। তারপর আরোহের পর প্রত্যবরোহ—যেমন দেখি যজ্ঞানুশাসনে। আরোহে পূষা ছিলেন দিশারী, এবার অগ্নি। বামদেবের কম্প্র আবেগ নিয়ে তাঁকে বলি, 'হে অগ্নি, হে পাবক, আমি কতটুকুই-বা তোমার কাছে। শুধু জানি, তোমার ব্রতে আমার অবহেলা ছিল না। কিন্তু আজ তোমার ভালবাসার হানা মননের এ কী গুরুভার চাপাল আমার 'পরে—যা বৃহৎ, যা গভীর, যা উচ্ছল, যা নাকি সব ছাওয়া।'[১৫]

যেমন উপনিষদের উপক্রম, তেমনি উপসংহার—দৃষ্টি ও ভোগের পর কর্ম। দেবতার কাছে যা পেয়েছি, সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে দিয়ে দেবঋণ শুধতে হবে। তাঁর দেওয়া ভার বইতে হবে তাঁরই ক্রতু আর রয়ির প্রেষণায়, তাঁর সত্যসঙ্কল্প আর প্রাণসংবেগের প্রচোদনায়।

শেষের দুটি মন্ত্রে তাই আবার প্রার্থনা :

বায়ুর্ অনিলম্ অমৃতম্ অথে দং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭

—বায়ু (হল) অনিল অমৃত, আর এই শরীর ভস্মান্ত। ওঁ। হে ক্রতু, স্মরণ কর, কৃতকে স্মরণ কর।—হে ক্রতু, স্মরণ কর, কৃতকে স্মরণ কর।

আগের মন্ত্রটিতে সত্য-দর্শনের যে-বিবৃতি আছে, প্রশ্ন হবে, তারপর এখানে আবার ফিরে আসা যায় কি না। কেউ-কেউ

ফিরে আসতে চান, কেউ চান না। অবশ্য এ-বিকল্প অতলের তীরে দাঁড়িয়েই সম্ভব। কিন্তু তার মধ্যে ঝাঁপ দিলে পর নিজের কোনও ইচ্ছা থাকে না, থাকতে পারে না। আর বিনাশোত্তর সত্যের বুভুক্ষা যাঁর মধ্যে জাগে, তাঁকে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিতেই হয়। অন্তঃস্রোতের টানে সমুদ্র কাউকে তলিয়ে নিয়ে যায়, সে আর ফিরে আসতে পারে না। ঢেউএ-ঢেউএ কাউকে আবার সে কূলে ফিরিয়ে দেয়। যিনি আর ফিরে আসেন না, তাঁর নির্বাণমুক্তি। আর যিনি বামদেবের মত ঈশসঙ্কল্পের বাহন হয়ে ফিরে আসেন, যিনি বলতে পারেন, 'বহূনি মে অকৃতা কর্ত্বানি'—আমার অনেক কিছু করবার আছে যা কেউ করেনি,[১] তিনি আধিকারিক পুরুষ। বৈবস্বত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নচিকেতারও সঙ্কল্প জেগেছিল, 'আমি ফিরে যাব, জগৎএর প্রতীতি বা স্বীকৃতি আদায় করব।'

লোকোত্তর সত্যের দর্শন হয় 'প্রেতি'র পর। আগেই দেখেছি এই প্রেতি মৃত্যুতে ঝাঁপিয়ে পড়া—স্ববশে। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে উৎক্রান্তি। উৎক্রান্তির পর অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি দুইই সম্ভব। আলোচ্য মন্ত্রটিকে মুমুক্ষুর আকূতি বা জীবন্মুক্তের উল্লাস দুই অর্থেই গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রকরণ থেকে মনে হয়, শেষের অর্থই সঙ্গত।

কৌষীতক্যুপনিষদে বিশ্বমূল তিনটি তত্ত্বের কথা আছে—প্রজ্ঞা প্রাণ আর ভূত অর্থাৎ চৈতন্য প্রাণ আর জড়। বলা হয়েছে, তিনটি অন্যোন্যাশ্রিত। 'যেমন রথচক্রের নেমি অরে অর্পিত, আবার অর নাভিতে অর্পিত, তেমনি ভূতমাত্রা অর্পিত প্রজ্ঞামাত্রায়, প্রজ্ঞামাত্রা অর্পিত প্রাণে। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর এবং অমৃত।'[২] প্রজ্ঞা ও প্রাণ অবিনাভূত হলেও এখানে জোর দেওয়া হয়েছে প্রাণের উপর, তাকেই পরমতত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উপনিষদে এটি একটি প্রাচীন দৃষ্টি, যার দরুন

মধ্যযুগপর্যন্ত 'বৈদিকাঃ প্রাণবাদিনঃ' এমন-একটা কথা এদেশে প্রচলিত ছিল।[৩] এই উপনিষদের গোড়াতেই আমরা যে-জিজীবিষার সবল ঘোষণা শুনেছি, তা এই প্রাণবাদেরই সমর্থক। সত্যদর্শনের পর প্রত্যবরোহও তা-ই।

প্রজ্ঞা প্রাণ ও ভূত এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে প্রজ্ঞা ও প্রাণ অমর্ত্য এবং ভূত মর্ত্য। কিন্তু সংহিতাতে পাই 'অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সয়োনিঃ'—অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই উৎস।[৪] এই মর্ত্য আধারে এই শরীরেই যে অজর অমৃত প্রাণ ও প্রজ্ঞার আনন্দময় প্রকাশ, এটি উপেক্ষণীয় নয়। একথা অতি সত্য যে **ভস্মান্তম্ ইদং শরীরম্**—এ-শরীর একদিন একমুঠা ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু এই ছাই হওয়াটাই তার গৌরবের। যাতে আগুন ধরে, তা-ই জ্বলতে-জ্বলতে ছাই হয়ে যায়। দেবাবেশের উদ্দীপনায় শরীর অগ্নিষাত্ত হবে যোগাগ্নিময় হবে, বৈদিক সাধনার এটি একেবারে গোড়ার কথা। সব-কিছু আগুনে ঢেলে দিয়ে আগুন হয়ে ওঠাই দৈনন্দিন যজ্ঞ বা ইষ্টির তাৎপর্য, যার চরম পরিণাম 'অন্ত্যেষ্টি'তে—যখন জীবনযজ্ঞের প্রবর্তক জাতবেদা তাঁর তপঃ দিয়ে শোচি দিয়ে অর্চিঃ দিয়ে প্রতপ্ত করবেন আমার এই মর্ত্য তনুর অন্তর্নিহিত 'অজ ভাগ'কে, তাঁর শিবতনু দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমায় নিয়ে যাবেন অমৃতচেতনার বৈপুল্যে।[৫] তখন আমার শরীর ভস্মান্ত হলেও আমার চক্ষু যাবে সূর্যে, প্রাণ বাতাসে, আমার সব-কিছু মিশে যাবে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে দ্যুলোকে—আমি হব সর্বময়, বহু শরীরে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত।[৬]

কিন্তু ব্যাপ্তিচৈতন্যের এই উদ্দীপ্ত অনুভব শুধু মরণে নয়, জীবনেও আসতে পারে। এই শরীরেই চেতনার 'প্রেতি' বা অগ্রায়ণ ঘটে, সংহিতার ভাষায় অগ্নি যার 'ইষণি' বা প্রচোদক।[৭] তাঁরই প্রেষণায় যখন 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' দ্বারা বাহিত হয়ে[৮] সূর্যদ্বার ভেদ করে সত্যের প্রজ্বল দর্শন নিয়ে আবার ফিরে আসি, তখন

আমার **বায়ুর্ অনিলম্ অমৃতম্**—আমার প্রাণ অননশীল অমৃত অর্থাৎ সেই অমৃত যা নিঃশ্বাস ফেলছে। এই ভস্মান্ত শরীর সেই সঞ্জীবন অমৃতে প্রস্ফুরন্ত।[৯]

ওপার হতে এপারে আসা সেই পুরুষের 'ক্রতু' বা চিকীর্ষাকে সত্যসঙ্কল্পকে বহন ক'রে। এই ক্রতু 'অগ্নিঃ কবিক্রতুঃ'—পৃথিবীতে বিবস্বানের দূতরূপ[১০] সেই অগ্নি যাঁর সামর্থ্য ক্রান্তদর্শী, যিনি জানেন কি 'কৃত' বা করা হয়েছে অতএব কি 'কর্ত্ব' বা করতে হবে। শত-ক্রতুর মতই তাঁর মধ্যে রয়েছে অর্থের সেই চেতনা, যা সানু হতে সানুতে আরোহণ করে চলে আর দেখতে পায় তার কি করবার আছে।[১১] আমার মধ্যে তিনি 'ধ্রুবং জ্যোতির্ নিহিতং দৃশয়ে কম্', যাঁকে ঘিরে বিশ্বদেবতার স্বচ্ছন্দ অভিযান সেই 'এক ক্রতু'র দিকে।[১২] সেই ক্রতুই এই ক্রতু, যিনি আমার অন্তর্যামিরূপে ভূত এবং ভব্যের ঈশান—যা হয়েছে এবং যা হতে হবে তার ঈশ্বর।[১৩] আমার অগ্নিম্বাত্ত জীবনের দিশারী এই কবিক্রতুকে বলি : **ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর**—ওম্…হে ক্রতু, স্মরণ কর—কৃতকে স্মরণ কর। আর 'ক্লিবে স্মর'—কি করতে হবে, তাও স্মরণ কর।

এই শেষের অংশটি আছে মাধ্যন্দিনশাখায়। সেখানকার পাঠ, 'ওঁ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর।' ক্লিব্ শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'ক্লিবে'। শব্দটি এসেছে কৢপ্ ধাতু হতে, যার অর্থ 'সম্পন্ন করা, গড়ে তোলা'। অনুরূপ শব্দ 'কল্প', যার রাহস্যিক অর্থ যজ্ঞের দ্বারা যজমানের হিরণ্যশরীর গড়ে তোলা। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে এবং আবৃত্তিহীন উৎক্রান্তিপক্ষে তাহলে মন্ত্রাংশের তাৎপর্য হবে, 'হে কবিক্রতু, হে অগ্নি,[১৪] আমার দ্বারা যে-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা স্মরণ কর আমার হিরণ্যশরীর নির্মাণের জন্য।'[১৫] আবার 'কৃত' অর্থ 'সত্য'ও হয়।[১৬] পাশার একটি ফোঁটা 'কৃত' বা 'সত্য', যাতে 'একং সৎ' বা পরমসত্যের ধ্বনি আছে।[১৭] যা-ই হ'ক না কেন, কৃতের

প্রচলিত ব্যাখ্যা 'বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিত কর্ম' এক্ষেত্রে সঙ্গত হয় না, কেননা উপনিষদে উৎক্রান্তির বর্ণনায় মৃত্যুকালে চেতনার হৃদয়ে সংহরণ এবং প্রদ্যোতনের কথাই আছে,[১৮] বিক্ষিপ্ত ভাবনার কথা নাই। কিন্তু মাধ্যন্দিনশাখার পাঠ হতে বোঝা যায়, এখানে কৃতের সহচর 'ক্লিপ্' বা 'কল্প', যা ভূত এবং ভব্যের অনুরূপ। হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে সত্যের মুখ দেখে আমি ফিরে আসছি যখন, তখন পূষার সহচর কবিক্রতু অগ্নিই আমার দিশারী, তিনি আমার অন্তর্যামী, আমার ভূত-ভব্যের ঈশান। তাঁর স্মৃতি প্রাকৃত স্মৃতি নয়, 'ধ্রুবা স্মৃতি' বা 'স্মর'[১৯]—অকাযায় চিদাকাশে বোধির ঝলক।

রহস্যদৃষ্টিতে, যা করা হয়েই আছে তা-ই কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ। লোকোত্তরে যা সিদ্ধ, লোকে তা-ই সাধ্য—যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনি, 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'।[২০] সংহিতায় এই নিমিত্তকর্তাকে বলা হয়েছে 'যোগ্য' অর্থাৎ অশ্বের মত দেবরথে যাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।[২১] তার কর্মের মূলে রয়েছে এক দিব্য ক্রতুর প্রেষণা। সেই ক্রতুময় পুরুষের ধ্রুবা স্মৃতিই নিমিত্তকর্তার কর্মের প্রয়োজক। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা, 'হে কবিক্রতু, বিশ্বের ঋতময় বিধানে যা কৃত হয়েই রয়েছে তাকে স্মরণ করে তার সম্ভূতির বেগকে আমার মধ্যে সঞ্চারিত কর।'

এই অগ্নিষ্বাত্ত পুরুষই মুণ্ডকোপনিষদের সেই ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, যিনি শুধু আত্মরতি এবং আত্মক্রীড়ই নন—যিনি ক্রিয়াবান্, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, যাঁর জীবন এক দিব্যক্রতুর উল্লাস।

তারপর সর্বাত্মভাবে ভাবিত হয়ে অগ্নির কাছে প্রার্থনা :

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্য্ অস্মজ্‌ জুহুরাণম্ এনঃ
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ ১৮

—হে অগ্নি, নিয়ে চল আমাদের সুপথ দিয়ে রয়ির দিকে—হে দেবতা, সব পথের দিশা জান যে তুমি। হটিয়ে দাও আমাদের থেকে কুণ্ডলীপাকানো পাপ। বারবার অবিরাম তোমায় আমরা নম-উক্তি পাঠাই (তীরের মত)।

এই মন্ত্রটি ঋক্‌সংহিতা হতে নেওয়া।[১] সেখানে এটি ঋষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির সাধারণ একটি প্রার্থনা। কিন্তু প্রার্থনা সর্বজনীন—একার জন্য নয়।

উপনিষদের প্রথমেই পেয়েছি এক উন্মুক্ত উদার দৃষ্টি—সবার মধ্যে থেকে সবাইকে স্বীকার করে নিয়ে ঈশের জ্যোতিতে সব-কিছুকে উদ্‌ভাসিত দেখা। জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা নয়, তাকে সুযমে সমৃদ্ধ করা—অগৃধ্নু ভোগ আর নির্লিপ্ত কর্মের দ্বারা। তারপর দেবতার আবেশে আত্মসচেতন হওয়া, আত্মাকে অনুভব করা সব-কিছুর অন্তরে এবং বাইরে, সব-কিছুকে জানা এবং পাওয়া আত্মস্বরূপে।

সর্বত্র অনুভবের প্রকার—আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি। তাইতে প্রজ্ঞানের ঘনতা এবং বিচ্ছুরণ। দুটিই যুগপৎ। সূর্যের তেজের সমূহন আর রশ্মির ব্যূহনের মত। তার ফলে সত্য-পুরুষের সাযুজ্য এবং সর্বাত্মভাব। আবার সবার মধ্যে ফিরে আসা এবং সর্বাত্ম-ভাবের সিদ্ধি—বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত দিব্যক্রতুর অনুভবে সবার সঙ্গে উজান বেয়ে চলায়।

অগ্নির কাছে সবার হয়ে সিদ্ধচিত্তের এই প্রার্থনা : **অগ্নে, নয় অস্মান্**—হে জাতবেদা, হে বৈশ্বানর, নেতা হয়ে পুরএত হয়ে আমাদের সবাইকে তুমি নিয়ে চল রায়ে—রয়ির দিকে, ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণসংবেগের সমুদ্রসঙ্গামিনী মুক্তধারার দিকে। 'রয়ি শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'রায়ে'। নিঘণ্টুতে রয়ি 'ধন'।[২] কিন্তু ধন একটি সামান্যসংজ্ঞা, বিনা নির্বচনে বোঝা যায় না, এ কোন্ ধন।

সাধারণত ধরা হয়, শব্দটি দানার্থক 'রা' ধাতু থেকে এসেছে। এই অনুমানের অনুকূলে ঋক্‌সংহিতায় একটিমাত্র প্রয়োগ পাওয়া যায় 'রাম্', যার বহুপ্রযুক্ত বিকল্পরূপ কিন্তু 'রয়িম্'। প্রচলিত অন্যান্য রূপ এসেছে গত্যর্থক 'রী' ধাতু থেকে। বৈদিক 'রয়ি' সংস্কৃতে 'রয়', যার অর্থ নদীবেগ। অনুরূপ আরেকটি শব্দ 'রেতঃ', যার মৌলিক অর্থ 'স্রোত'।[৩] ঋক্‌সংহিতায় সিন্ধু বা নদী 'রেবতী', 'আপো রেবতীঃ', সমুদ্র 'ধরুণো রয়ীণাম্', পূষা 'রায়ো ধারা'।[৪] শতপথব্রাহ্মণে 'মুখ্যা অপ্'রূপে বৈশ্বানর রয়ি।[৫] ছান্দোগ্যে তাঁর বস্তি বা মূত্রাশয় রয়ি।[৬] এইসব প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, রয়ির মৌলিক অর্থ 'সংবেগ' এবং অপ্-এর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় তা প্রাণের সংবেগ, কেননা বেদে অপ্ প্রাণের প্রতীক। এই রয়ির একটি বর্ণাঢ্য বর্ণনা আছে ঋক্‌সংহিতার সৌচীকাগ্নিসূক্তে, তাতে 'রী' ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়।[৭]

অগ্নি আমাদের রয়ির কূলে নিয়ে যাবেন **সুপথা**—একটি শোভন পথ দিয়ে, কেননা তিনি **বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্**—সব পথের খবর জানেন। এই পথের বর্ণনা আছে ছান্দোগ্যে : হৃদয়ের একশ'-একটি নাড়ীর মধ্যে একটিই চলে গেছে মূর্ধার দিকে—যাকে ধরে উজিয়ে গেলে পাওয়া যায় অমৃতত্ব।[৮] বৃহদারণ্যকে এটি 'হিতা' নাড়ী,[৯] মাধ্যন্দিনসংহিতায় 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ,[১০] ঋক্‌সংহিতায় 'অন্তঃস্থ শুভ্র একটি পথ' যাতে 'নিহিত' হয়ে সোমের ধারা উজিয়ে চলে।[১১] গত্যর্থক 'বী' ধাতু হতে 'বয়ুন' বা পথ।

কিন্তু গোড়ায় পথ ঋজু নয়, তার মাঝে-মাঝে রয়েছে বাঁক—যার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে **জুহুরাণম্ এনঃ** বা কুণ্ডলীপাকানো পাপ। 'জুহুরাণ' এসেছে 'ধ্বৃ' বা 'হ্বৃ' ধাতু থেকে, যার অর্থ সাপের মত আঁকাবাঁকা হয়ে চলা। এই বাঁকা চালের আরেক নাম 'ধ্বরঃ' বা 'ধূর্তি'—বাংলায় যা ধূর্তামি। তার বিপরীত হল 'অধ্বর'—যা যজ্ঞের

একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা। যজ্ঞ সরল হৃদয়ের সহজ আত্মাহুতি, তার মধ্যে বাঁকা চাল নাই। আমাদের মধ্যে কোথাও যদি ধূর্তি থেকে থাকে, তাকে হে দেবতা, **যুয়োধি অস্মৎ**—দূর করে দাও আমাদের থেকে, গুহাগ্রন্থি বিকীর্ণ করে আমাদের আর্জবে প্রতিষ্ঠিত কর। আমরা যেন

ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম—বারবার হৃদয় উজাড় করে তোমার মধ্যে নিজেকে লুটিয়ে দিই, আর এই প্রণতিকে ব্যক্ত করি বন্দনার মন্ত্রে, নিত্যজাগ্রত চিত্তের শরবৎ তন্ময়তায় যেন পৌঁছই তোমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একটি নিবিড় স্পর্শের জন্য—'জায়ে.র পত্য উশতী সুর্.াসাঃ'।[১২]

'অসার অসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি'—এই সাযুজ্যবোধের পর আত্মবিকিরণের প্রেরণা সেই আদিত্যপুরুষের স্বধর্মের অনু-বর্তনায় আপনি আসে। তখন সবার সঙ্গে সবার হয়ে তাঁর দিকে ভেসে চলাই জিজীবিষার পরম তর্পণ।

এইখানেই উপনিষদের শেষ।

সমস্ত উপনিষদটিতে আমরা এই পেলাম :

সর্বত্র ঈশের অনুভবের দ্বারা দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করলে ব্যবহারে ভোগ অনুবিদ্ধ হবে ত্যাগের দ্বারা, কর্ম হবে নির্লিপ্ত। এইভাবে দিব্যভোগ এবং দিব্যকর্ম করে শতবর্ষ বাঁচতে হবে। দৃষ্টি ভোগ ও কর্মের দিব্যরূপায়ণেই জিজীবিষার সার্থকতা।

কখনও আত্মবিস্মৃত হতে নাই। আত্মভাবনাকে ঈশভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে সবসময় তাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

ঈশ 'একং তৎ'—তিনি এক, তিনি অনির্বচনীয়—একাধারে স্পন্দিত এবং নিস্পন্দ। বিশ্বে যখন তিনি স্পন্দিত, তখন তিনি মাতরিশ্বা বা বিশ্বপ্রাণ, তাঁর মধ্যে বিশ্বের উল্লাস। তিনি কাছে এবং দূরে—সর্বত্র।

তাঁকে জানতে হবে আত্মা বলে। এ-জানা জাগ্রতের জানা। আত্মস্বরূপের ভূমিকায় সর্বভূতকে দর্শন করা, আত্মাকে সবার মধ্যে দেখা অন্তর্যামিরূপে এবং পরম উপলব্ধিতে আত্মাকে এবং সর্বভূতকে এক বলে জানা—আত্মানুভবের এই ত্রিপুটী।

যিনি 'একং তৎ', যিনি আমাদের আত্মা, তিনি একাধারে যেমন শুক্র অকায় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তেমনি মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভূ এবং বিধাতা।

অসৎ এবং সৎরূপে তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক বিভাবের মধ্যে যে-আপাতবিরোধ, যথাক্রমে আত্মায় এবং বিশ্বে তার সমন্বয় ঘটাতে হবে—অবিদ্যা ও বিদ্যার, বিনাশ ও সম্ভূতির সহবেদনের দ্বারা।

পূষারূপে তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন দিশারী হয়ে হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে দেন যাতে আমরা সত্যধর্মা হয়ে সত্যের মুখ দেখতে পাই, যেন তাঁর কল্যাণতম রূপের দর্শনে আমি তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি।

সেই দর্শনের পর অগ্নিরূপী তাঁর কাছে প্রার্থনা, আমি যেন সর্বাত্মক হয়ে তাঁর দিব্যক্রতুকে বহন করতে পারি। তিনি যেন দিশারী হয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে চলেন তাঁর ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণসংবেগের কূলে। আমাদের মধ্যে যেন ধূর্তি না থাকে, আমরা যেন নিজেকে লুটিয়ে দিতে পারি তাঁর মধ্যে।

এমনি করে সমগ্র উপনিষদটিতে একটি অখণ্ড জীবনদর্শন সুচারুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শুক্লযজুর্বেদ শুক্লকর্মের বিধায়ক। যে-কর্ম জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়, তা-ই শুক্ল। আমরা যেন ঈশকে জেনে ঈশকে পেয়ে সবার মধ্যে এই উন্মেষ ঘটানোর তপস্যায় প্রাণ দিতে পারি—এই হল শুক্লযজুর্বেদের অনুশাসন এবং উপনিষদ।

ওঁ পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার পাঠভেদ :

মা. ৬ ন 'বিচিকিৎসতি'—চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব হয়।

মা. ৯-১১=কাণ্ব. ১২-১৪; মা. ১২-১৪=কাণ্ব. ৯-১১। কাণ্বশাখায় সাধনার ক্রম প্রত্যগনুভব হতে পরাগনুভবে যাওয়া; মাধ্যন্দিন শাখায় তার বিপরীত।

মা. তে প্রার্থনামন্ত্রগুলির বিন্যাস ও পাঠ :

বায়ুর্ অনিলম্ অমৃতম্ অথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৫
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্......॥ ১৬
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যা. পিহিতং মুখম্।
যো অসাব্ আদিত্যে পুরুষঃ সো অসাব্ অহম্।
ওঁ খং ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥

পঞ্চদশ মন্ত্রটি বিস্তার দ্বারা অমৃতানুভবের প্রকার এবং প্রত্যবরূঢ় চেতনায় ক্রতুর উদ্দীপন। ষোড়শ মন্ত্রে সর্বাত্মভাবের অনুভব। সপ্তদশ মন্ত্রে সর্বাত্মভাবের কেন্দ্রে সাযুজ্যের অনুভব: 'সবার পক্ষে সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা ঢাকা থাকলেও আমার পক্ষে নয়। আমি অনুভব করছি ওই আদিত্যে যে-পুরুষ, আমি হচ্ছি সে-ই।' কিন্তু তার পিছনেই নিত্যজাগ্রত রয়েছে 'নীলং পরঃকৃষ্ণং'-রূপে আকাশ-ব্রহ্মের অনুভব—যেমন জীবনে, তেমনি মরণে। লক্ষণীয়, কাণ্বশাখায় কোথাও ব্রহ্মের উল্লেখ নাই।

টীকা

সঙ্কেত-পরিচয়

ঈ. ঈশোপনিষৎ।
ঋ. ঋক্‌সংহিতা।
ঐআ. ঐতরেয়ারণ্যক।
ঐউ. ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐব্রা. ঐতরেয়ব্রাহ্মণ।
ক. কঠোপনিষৎ।
কে. কেনোপনিষৎ।
কৌ. কৌষীতক্যুপনিষৎ।
গী. গীতা।
ছা. ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
তা. তাণ্ড্যব্রাহ্মণ।
তু. তুলনীয়।
তৈউ. তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈব্রা. তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ।
তৈস. তৈত্তিরীয়সংহিতা
নি. নিরুক্ত।
নিঘ. নিঘণ্টু।
প্র. প্রশ্নোপনিষৎ।
প্রতিতু. প্রতিতুলনীয়।
দ্র. দ্রষ্টব্য।
বৃ. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

বেমী.	বেদমীমাংসা (প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার, পরের সংখ্যা টীকার)।
মস.	মনুসংহিতা।
মা.	মাধ্যন্দিনসংহিতা।
মাণ্ডু.	মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।
মু.	মুণ্ডকোপনিষৎ।
যোসূ.	পাতঞ্জলযোগসূত্র।
শ.	শতপথব্রাহ্মণ।
শ্বে.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
সূ.	সূক্ত।

ভূমিকা : ১ গী. ১০।২৬। ২ ঈ. ১৬ ; তৈউ. ২।৮ ; বৃ. ২।৫।১৯, ৪।৪।৫ ; মাণ্ডু. ২। ৩ গী. ৪।৩৩। ৪ ঋ. ১০।১২১ সূ.। ৫ ১।৩।৭। ৬ শান্তি ৯৯ ; দ্র. 'বাচস্পত্যম্'। ৭ বেমী. ১০০[৮]; তু. ঐআ. বিশ্বামিত্রম্ …ইন্দ্র উপনিষসসাদ, স বৃহতীসহস্রং শশংস ২।২।৩। ৮ বেমী. ১০১[১২]। ৯ বেমী. ১০০[৯]।

সাধারণ পরিচয় : ১ ঋ. ১০।৭১।১১। ২ বেমী. ৬২[৬৪]। ৩ শ. ১৪।৯।৪।৩৩। ৪ গী. ৪।১৮।

শান্তিপাঠ : ১ বৃ. ৫।১।১। লক্ষণীয়—মাধ্যন্দিনশাখায় উপনিষৎ শেষ হয়েছে 'ওঁ খং ব্রহ্ম' বলে। কিন্তু কাণ্বশাখায় কোথাও 'ব্রহ্মে'র উল্লেখ নাই। ২ তু. ছা. ৩।১৭।৬, ৮।১।৫, ৭।১ ; তৈউ. ২।৮। ৩ ছা. ৩।১২।৯, বৃ. ২।১।৫। ৪ তু. ছা. তদ্ বা এতদ্ যদ আদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব ৩।৫।৩। ৫ ঋ. ১।১৬৪।৪২। ৬ ঋ. ৩। ২৬।৯। ৭ বৃ. ৫।১।১।

প্রস্তাবনা : ১ ছা. ২।২৩।১।

মন্ত্র ১ : ১ শৌ. ১৯।৬।৪। ২ বৃ. ৩।৮।৯, ৭।২৩। ৩ মাণ্ড. ৬। ৪ ঋ. ১০।৯০।১, ১২১।১, ৯০।২। ৫ ঋ. ১০।১৩০।৫। ৬ ঋ. ১০।১২৩।১।

৭ ঋ. ১।১১৩।১৬। ৮ বেমী. ১৮৫[৪৫৮]। ৯ ছা. ৩।১৪।১। ১০ তু. শ. অসুরা অতিমানেনৈ.ব কস্মিন্ নু বয়ং জুহুয়ামে.তি স্বেষে.বা.স্যেষু জুহ্বতশ্চেরুঃ ৫।১।১।১। ১১ বৃ. ৪।৪।২১।

মন্ত্র ২ : ১ শ্বে. ১।৩। ২ গী. ১৩।২৩। ৩ বেমী. ১৮৫[৪৬২]। ৪ শ্বে. ২।১২। ৫ শিবসূত্রবিমর্শিনী সূত্র ১। ৬ ঋ. ২।১২।৫। ৭ ঋ. ৩।৫৩।১৪। ৮ বৃ. ২।৪।১২। ৯ ঋ. ১০।১৪।৭। ১০ ঋ. ১।১৬৪।৪২, ১০।৭২।২,৩। ১১ ছা. ১।১০।৫। ১২ ছা. ৩।১৬...। ১৩ শ. ১১।৫।৬।১-২। ১৪ নি. ৫।১।২। ১৫ গী. ৭।৮।

মন্ত্র ৩ : ১ তু. শ. দিবা দেবান্ অসৃজত নক্তম্ অসুরান্, যদ্ দিবা দেবান্ অসৃজত তদ্ দেবানাং দেবত্বম্, যদ্ অসূর্যং...তদ্ অসুরাণাম্ অসুরত্বম্ ৫।৩।৪।১। ২ বৃ. ২।৪।১২। ৩ বৃ. ১।২।১, ৭। ৪ ঋ. ১০।১৬।৪। ৫ বৃ. ১।৪।১০। ৬ ছা. ১।৬।৫...। ৭ ঋ. ১০।১২৯।১, ৩। ৮ যোসূ. ১।১৯। তু. বৃ. য এবং বেদা.হং ব্রহ্মা.স্মী.তি, সর্বং স ইদং ভবতি...আত্মা হ্যে.ষাং স ভবতি ১।৪।১০। ৯ ক. ২।২।১৫। ১০ বৃ. ১।৪।১০। ১১ বৃ. র অনুরূপ একটি মন্ত্রে আছে 'অনন্দা নাম তে লোকাঃ...অবিদ্বাংসোঽবুধা জনাঃ ৪।৪।১১। তার মাধ্যন্দিনশাখার পাঠে আবার আছে 'অসূর্যাঃ'। 'অনন্দা লোকাঃ' তু. ক. ১।৩। লক্ষণীয়, মুনিপন্থায় মোক্ষ প্রায়শ 'দুঃখাভাবমাত্র', কিন্তু সুখস্বরূপ নয়। ১২ প্রেতি. তু. বেমী. ৮৭, ১৭৪[৫]।

মন্ত্র ৪ : ১ দ্র. বৃ. ৩।৭, উদ্দালক আরুণির প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য। ২ বৃ. ২।৩।১...। ৩ ঋ. ১।১৬৪।৪৬, ৫।৬২।১ ; তু. গী. 'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মের নির্দেশ ১৭। ২৩-২৭। ৪ শ্বে. ৬।৯। ৫ ছা. ৩।৫।৩। ৬ ঋ. ১০।৭১।৮ ; সূ. ১।২।৪। তু. বৌদ্ধদর্শনে 'চিত্তের জবন' ও 'বীথীচিত্ত' ; যোসূ. মনোজবিত্ব ৩।৪৮। ৭ তু. ঋ. উতা.মৃতত্বস্যে.শানো যদ্ অন্নেনা.তিরোহতি ১০।৯০।২। মু.তে অগ্নির চতুর্থ শিখা 'সুলোহিতা' বা 'সুরোহিতা'। ৮ ঋ. ১।১০।২। ৯ ছা. ৬।৮।১-২ ; তু. বৃ. ৪।৩।১৯। ১০ ঋ. হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু ১০।৭১।৮। ১১ বৃ. ৪।৩।১৫। ১২ ক. ১।২।১২। ১৩ <ঋষ্ 'চলা, বিদ্ধ করা,

দেখা'। তু. বেমী. ১৮৭^{৪৭৪}। ১৪ ঋ. ৩।২৯।১১। ১৫ ক. ২।১।৭। ১৬ ঋ. ১০।৭২।৮-৯।

মন্ত্র ৫ : ১ ক. ২।৩।২। ২ তৈস. ৫।৫।৯।৩ ; শৌ. ৭।৮৭।১ ; শ্বে. ২।১৭। ৩ বৃ. ৪।৪।৫। ৪ ছা. ৩।১২।৭-৯। ৫ ক. ২।১।৫। ৬ শৌ. ১০। ৮।৩২। ৭ ঋ. ৬।৪৭।১৮ ; বৃ. ২।৫।১৯। ৮ ঋ. ১০।৯০।২। ৯ ঋ. ১০।৯০।১।

মন্ত্র ৬, ৭ : ১ বৃ. ২।৪।৫। ২ বৃ. ২।৫।১৯। ৩ ঋ. ১।১১৫।১। ৪ তু. গী. ৮।৯। ৫ তু. গী. ১৩।২৩। ৬ তু. ক. ২।২।১১। ৭ বৃ. ২।৫।১৯, ৪।২।৪, ৪।২২, ৫।১৫। ৮ ছা. ৬।৮।৭, ৯।৪, ১০।৩...। ৯ সাংখ্যের পরিভাষা অনুসারে 'মোহ' তমঃ আর 'শোক' রজঃ হতে উৎপন্ন। মোহ আর শোকের অপ্রাকৃত রূপ : 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা.স্তি' কে মৈত্রেয়ীর ভুল করা 'মোহ' বলে বৃ. ২।৪।১২-১৩, ৪।৫।১৩-১৪।

মন্ত্র ৮ : ১ বৃ. ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।২২, ৫।১৫। ২ ঋ. ১।১৬৪।৪২। ৩ ঋ. ১। ১৩।১৬, ১১৫।১। ৪ তু. ঈ. ১৬। ৫ ঋ. ৪।৪০।৫। ৬ ছা. ১।৬।৫ ; দ্র. ৬। ৭ ঈ. ১৬। ৮ ছা. ১।৬।৬। ৯ ক. ২।২।১৫। ১০ বৃ. ৪।৫।১৩। ১১ তু. ঈ. ১৫ ; কে. ৪।৪ ; ছা. ১।৬।৬। ১২ বৃ. ৪।৪।২২ ১৩ ঋ. ৬।৪৭।১৮। ১৪ তু. ঋ. ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্ বিভীদকো অচিত্তিঃ, অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্ চনে.দ অনৃতস্য প্রয়োতা ৭।৮৬।৬ (দ্র. বেমী. ৩৭৮।২৩৩^{৩})। ১৫ ঋ. ১।১২৯।১১ ; শ. ৬।৪।২।৩, ১১।১।৫।৭। ১৬ বৃ. ১।৩।১, ৫।২।১ ; ছা. ১।২।১। ১৭ ঐব্রা. ২।২। ১৮ ছা. ১।২...। ১৯ বৃ. ৪।৪।২৩, ২২। ২০ বৃ. ৪।৪।২২ ; তু. শৌ. শান্তং নো অস্তু কৃতাকৃতম্ ১৯।৯।২ ; ছা. ৮।৪।১। ২১ মস. ৫।৫৬। ২২ দ্র. বেমী. ৩২৪।১৭৪^{৩}। ২৩ ঋ. ১০।১২৯।৪। ২৪ ঋ. ঐ। ২৫ 'বিসৃষ্টি' ঋ. ১০।১২৯।৬-৭। তু. বৃ. অহং বাব সৃষ্টির্ অস্মি ১।৪।৫ ; ছা. তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে.তি ৬।২।৩। ২৬ শৌ. ১০।৮।৩২। ২৭ তু. ঋ. ১।১৬৪।৭৫, ১০।৯০।৩। ২৮ ঋ. ১।৬১।২ ; তু. ক. ২।৩।৯। ২৯ বৃ. ৪।১।৭। ৩০ ছা. ৮।৩।৩। ৩১ তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, ১১ ; দ্র. বেমী.

৩৫৯।২১৩[৪] ; আরও তু. ঋ. ১০।১২৯।৪। ৩২ তু. ঋ. ১০।১১৪।৮ ; দ্র. বৃ. পুরুষের বোধা-পাতন ও সৃষ্টি ১।৪।৩-৪। ৩৩ ঋ. ১০।৭২।২, ৩। ৩৪ কৌ. ৩।৩। ৩৫ তু. ঋ. ১০।১৯১।১। ৩৬ ঋ. ১০।১৯১।২ (তু. 'মিষতো' বশী)। ৩৭ ঋ. ১।১০।২। ৩৮ তু. উব্বট ও মহীধরের মাধ্যন্দিনশাখার ভাষ্য।

মন্ত্র ৯-১৪ : ১ নবম মন্ত্রটি বৃ.র ৪।৪।১০ (মাধ্যন্দিনশাখায় কিন্তু 'অবিদ্যা'র জায়গায় আছে 'অসম্ভূতি', 'বিদ্যা'র জায়গায় 'সম্ভূতি')। আবার এই উপনিষদের মাধ্যন্দিনশাখায় আগে অসম্ভূতি-সম্ভূতির সহবেদন, তারপর অবিদ্যা-বিদ্যার। ২ কে. ১।৪, ২।২। ঈ.র সঙ্গে ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ৩ মা. ৩১।১৮। ৪ কে. ২।৩। ৫ দ্র. বেমী. ৮৬..., ১৭৩[৫৪]। ৬ ঋ. ১০।১২৯।৩,১, ৭। ৭ বৃ. ২।৪।১২...। ৮ ক. ১।১।২০। ৯ ক. ২।২।১৫। ১০ ঋ. ১০।১৪।৭। ১১ ছা. ৬।২।১। ১২ ঋ. ১০।১২৯।২। ১৩ ঋ. ১০।৭২।২, ৩। প্রতিতু. ছা. ৬।২।১-২। তৈউ তে দুটি পক্ষই মেনে নেওয়া হয়েছে (২।৩)। ১৪ ঋ. ১০।১২৯।১। তু. মু. ২।২।১, শ্বে. ৪।১৮। ১৫ তৈউ. ২।৬। ১৬ তু. গী. ২।৭২ ; ঈ. ১৪ ; ঋ. ২।২৮।১১, 'আপি' আপন জন, শূন্যতার দেবতা বরুণকে বলা হয়েছে। ১৭ ঈ. ১৬ ; ঋ. ১০।৬৬।৪। ১৮ দ্র. বেমী. ৮৯। ১৯ ঋ. ১০।১৩৫ সূ. ; তৈব্রা. ৩।১১।৭... ; ক. ১।১।৭। ২০ ঈ. ১৬। ২১ ঋ. ১০।১২৯।১, ২ ; শ্বে. ৪।১৮। ২২ ঋ. ১০।১২৯।৪। ২৩ তু. ক. ১।২।৬। ২৪ ঋ. ৮।৫৮।২। দ্র. ৬।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮। ২৫ ঋ. ১০।১২৫।৮। ২৬ বৃ. ২।১।৫ ; ছা. ৩।১২।৯। ২৭ ঋ. ১০।৭২।২, ৩, ১২৯।৪ ; ছা. ৬।২।১, ২ ; তৈউ. ২।৬ ; শ্বে. ৪।১৮, তু. ঋ. ১০।১২৯।১ ; মু. ২।২।১। ২৮ ঋ. ১০।৯০।৩। ২৯ শৌ. ১০।৮।৩২। ৩০ তৈউ. ৩।১০।৬ ; দ্র. সামসংহিতা ৬।১।৯। ৩১ তা. ২৫।১০।১। ৩২ দ্র. তা. ঐ (সায়ণ) ; ঋ. ৭।৯৫।২। ৩৩ তা. ২৫।১০।১২, ১৬, ২১। ৩৪ তু. ঋ. ১।৩।১২। ৩৫ ঋ. ৭।৯৫।২। ৩৬ তা. ২৫।১০।১৬।

মন্ত্র ১৫ : ১ বৃ. ৫।১৫।১-৪। ২ ঋ. ১০।১৭।৩-৫। দ্র. বেমী. ৩৮৩।২৪১[৬]। ৩ সবাই এ-মত গ্রহণ করেননি। দ্র. রামানুজমতানু-যায়ি নারায়ণকৃত 'প্রকাশিকা', আনন্দাশ্রমসংস্করণ। ৪ কে. ২।৫।

৫ ঋ. ১।২২।১৬। ৬ ঋ. ৫।৬২।১; দ্র. বেমী. ২৯৯।১৩০। ৭ দ্র. বেমী. 'ত্বষ্টা' ৪৭৭…। ৮ শৌ. ১২।১।৬০। ৯ ঋ. ১০।১৭০।৩। ১০ ঐব্রা. ১।২৩; শ. ৩।৪।৪।১। ১১ ঋ. ১০।১৭০।২। ১২ বৃ. ১।৪।১৪। ১৩ নি. ১১।১…। ১৪ ঋ. ১।১৫৫।৬। ১৫ ঋ. ১।১১৩।১৬; তু. প্র. ১।৮। ১৬ ঋ. ১০।১৭।৩। ১৭ ঋ. ১০।১৭।৪। ১৮ ছা. ২।২৪।১১-১৬; ঋ. ৫।৬২।১, ১।২৫।১০, ১৩। ১৯ মৈত্রায়ণ্যুপনিষদে এই মন্ত্রের পাঠে আছে 'সত্যধর্মায় বিষ্ণবে' ৬।৩৫। ২০ ক. ১।২২।১৮।

মন্ত্র ১৬: ১ ঋ. ১০।১২১।১০, ১, ২, ৮, ৯, ৬। ২ ঋ. ১।১১৩।১৬। ৩ ঋ. ৭।৩৩।৭। ৪ দ্র. বৃ. ৪।২।২-৩। ৫ ছা. ৪।১৫।৫, ৫।১০।২; বৃ. ৬। ২।১৫ (প্রচলিত পাঠ 'পুরুষো মানসঃ'; এখানে সন্ধিবিচ্ছেদে 'পুরুষঃ অমানসঃ' করাই মনে হয় সঙ্গততর; তাহলে ছান্দোগ্যের 'অমানবঃ' বিশেষণের সঙ্গে খাপ খায়; কেননা, মানব 'মনোময়', সুতরাং অমানব 'বিজ্ঞানময়'='অমানস' অর্থাৎ মনের ওপারে। ৬ কৌ. ১৫।১।৬; ঋ. ১০।১০৩।১। ৭ শৌ. ১০। ৭।১৪। ৮ কাঠকসংহিতা. ৪০।১১।৫। ৯ বৃ. ২।৬।৩। ১০ প্র. ২।১১। ১১ দ্র. নি. ১২।১৯; ঋ. ১।২২।১৭। ১২ ঋ. ১০।৮২।২; বেমী. ৩০০। ১৩৩। ১৩ ঋ. ১।১৬৪।২১। ১৪ বৃ. ৪।৩।২১। ১৫ ঋ. ৪।৫।৬।

মন্ত্র ১৭: ১ ঋ. ৪।১৮।২। ২ কৌ. ৩।৮। ৩ শিবসূত্রবিমর্শিনী সূত্র ১। ৪ ঋ. ১।১৬৪।৩০। ৫ ঋ. ১০।১৬।৪। ৬ ঋ. ১০।১৬।৩। ৭ ঋ. ৬।১।৮। ৮ মা. ১৮।৪০; নি. ২।৬। ৯ তু. ঋ. য়দ্ এমি প্রস্ফুরন্ন্ ইব দৃতির্ ন ধ্মাতঃ ৭।৮৯।২। ১০ দ্র. বেমী. ৩৪২…। ১১। ঋ. ১।১০।২। ১২ দ্র. ঋ. ৬।৯।৫; বেমী. ২৪৯।২৮। ১৩ ক. ২।১।১২-১৩। ১৪ ক্রতু=অগ্নি। তু. ঋ. ১।৬৭।২, স হি ক্রতুঃ ৭৭।৩। ১৫ তু. ঋ. ১০।১৬।৪; মু. ১।২।৫-৬। ১৬ তু. ঋ. ১০।১১১।১; প্র. ইষ্টাপূর্তে কৃতম্ ইত্যু.পাসতে ১।৯; গী. সাংখ্যে কৃতান্তে ১৮।১৩। ১৭ তু. ঐব্রা. কৃতং সম্পদ্যতে চরন্ ৭।১৫। ১৮ বৃ. ৪।৪।২-৪…। ১৯ তু. ছা. ৭।১৩।১; ২৬।২; দ্র. বেমী. ১৫৭[২৪২]। ২০ গী. ১১।৩৩। ২১ ঋ. ১০।৫৩।১১; তু. ৫।৪৬।১ (বেমী. ৪১৪।২৯৭)।

মন্ত্র ১৮ঃ ১ ঋ. ১।১৮৯।১। ২ নিঘ. ২।১০। নিঘণ্টুর দেওয়া এই অর্থটিই সবাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'উদক'-নামেও 'রয়ি'র পাঠ আছে (১।১২) এবং সেটিই তার ব্যুৎপত্তিলভ্য মুখ্য অর্থ। তা থেকে 'ধন' অর্থ গৌণ। ৩ তু. ঋ. ১।৬৮।৪ ('রয়ি' শব্দের সহচার লক্ষণীয়), ১০।১২৯।৪। ৪. ঋ. ১০।১৮।১, ৩০।১২, ৫১।১, ৬।৫৫।৩। ৫ শ. ১০।৬।১।১১। ৬ ছা. ৫।১৮।২। ৭. ঋ. ১০।৫৩।৮। ৮ ছা. ৮।৬।৬। ৯ বৃ. ২।১।১৯, ৪।২।৩, ৩।২০। গোড়ায় জালের মত, তাই 'নাড্যঃ' বহুবচন। কিন্তু উপরের দিকে জাল টানবার দড়ির মত একটিই খাত। তু. হঠযোগের 'জালন্ধর' বন্ধ, মুদ্রা, পীঠ। ১০ মা. ১৮।৪০। ১১ ঋ. ৯।১৫।৩। ১২ ঋ. ১০।৯১।১৩।